বাংলাদেশের নানান ভাষা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

বাংলাদেশের নানান ভাষা • মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

'দেশের মাটি, মানুষ, ভাষা ও প্রকৃতি কীভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে তার সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো এ বইয়ে। উন্নত বা উন্নয়নশীল ভাষাগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান বৃদ্ধিকল্পে এবং বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যেন পরস্পরকে সঙ্গদানে ও মতবিনিময়ে স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক দেশবাসী হয়ে একাত্মবোধ করতে পারে, এমন আশা থেকে এই সংকলনের উদ্যোগ।

এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভাষা ছাড়াও কিছু কিছু ভাষার উল্লেখ করেছি, যেগুলো মৌখিকভাবে চালু আছে। যেসব ভাষার বর্ণমালা নেই, সেসব ভাষাও বাংলা হরফে লেখা হচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা বলে—এই বিশ্বাসেই এ গ্রন্থের প্রণোদনা ও স্ফূর্তি।'

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

Taka 160.00

এক হিসাবে দেখা গেছে, ৩৭টির বেশি ভাষাভাষী নাগরিকের বাস বাংলাদেশে। বলতে গেলে তাদের অনেকের খোঁজখবর জানি না। এ বইয়ে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সংক্ষেপে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু ভাষার পরিচয় দিয়েছেন, পাশাপাশি তুলে ধরেছেন আদিবাসী জনজাতিগুলোর ভাষা-পরিচয়। তিনি ছোট ছোট নৃগোষ্ঠীর বর্ণমালা তুলে ধরেছেন, আলোচনা করেছেন সেসব ভাষা নিয়েও, যেগুলোর বর্ণমালা বা লিখিত রূপ নেই। ভাষাগুলোর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক সেসব ভাষায় মাতৃভাষা নিয়ে লেখা কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, উপস্থাপন করেছেন তার বাংলা অনুবাদও। প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠী স্বভাবতই তাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসে এবং মাতৃভাষার উন্নয়নে কিছু-না-কিছু কাজ করছে। এ বইয়ে তারও কিছু পরিচয় মিলবে। বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় বই এই প্রথম।
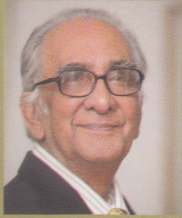
আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮, ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের দয়ারামপুর গ্রামে। ইতিহাসে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। আইন বিষয়ে স্নাতক। ১৯৫৮ সালে আধুনিক ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক সম্মান (অক্সফোর্ড) এবং ১৯৫৯ সালে ব্যারিস্টার হন। অধ্যাপনা করেছেন রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৪ সালে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হন। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৬ সালে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১০০। উল্লেখযোগ্য বই : *যার যা ধর্ম : বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান; যথাশব্দ; কোরানসূত্র; বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; ভাষার আপন পর; গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ; রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার; টোয়েন্টি-ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি স্পিক্স ফর অল ল্যাঙ্গুয়েজেস* ইত্যাদি। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক। ১১ জানুয়ারি ২০১৪ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

বাংলাদেশের নানান ভাষা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

বাংলাদেশের নানান ভাষা

উ ৎ স র্গ

ফিলিপ গাইন
মং মং চাক
এ কে শেরাম
রনজিত সিংহ

ভূমিকা

৬ মার্চ ২০১৩ সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ জাতীয় সংসদকে জানান যে বাংলা ভাষা ছাড়াও দেশে আরও ৩৭ ভাষাভাষীর নাগরিক রয়েছে। নিবিড় গণনায় এই সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বদৌলতে দেশের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে স্ব-স্ব ভাষার প্রতি দরদ ও মমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব ভাষায় বর্ণমালা নেই, সেই ভাষাগুলোতেও বাংলা হরফ ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সরকার ও কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সব ভাষাগোষ্ঠীর কিছু কবিতা বা ছড়া এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। এ ধরনের সংকলন হয়তো এই প্রথম। দেশের মাটি, মানুষ, ভাষা ও প্রকৃতি কীভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে তার সামান্য পরিচয় দেওয়া হলো এ বইয়ে। উন্নত বা উন্নয়নশীল ভাষাগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান বৃদ্ধিকল্পে এবং বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যেন পরস্পরকে সঙ্গদানে ও মতবিনিময়ে স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক দেশবাসী হয়ে একাত্মবোধ করতে পারে, এমন আশা থেকে এই সংকলনের উদ্যোগ।

এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ভাষা ছাড়াও কিছু কিছু ভাষার উল্লেখ করেছি, যেগুলো মৌখিকভাবে চালু আছে। যেসব ভাষার বর্ণমালা নেই, সেসব ভাষাও বাংলা হরফে লেখা হচ্ছে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়'—এই বিশ্বাসেই এ গ্রন্থের প্রণোদনা ও স্ফূর্তি। এই লেখাগুলো ২০১৩ সালের পয়লা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোয়* ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হলো। এই গ্রন্থের জন্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সৌরেন বিশ্বাস, অধ্যাপক

মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, অধ্যাপক স্বপন নাথ, ফিলিপ গাইন, পাভেল পার্থ, মং মং চাক, এ কে শেরাম, উজ্জ্বল আজিম, মোহাম্মদ হাসান, তৈমুর রেজা এবং *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ ও কবি জাফর আহমদ রাশেদ। এই গ্রন্থে যেসব কবির কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বর্তমানে জীবিত আছেন—এ কে শেরাম, কালিদাস রায়, খিং রিয়ান, জগৎজোতি চাকমা, নন্দরানী মিনৃজ, ফুয়াত লেথ থুলুক, মতেন্দ্র মানখিন, রনজিত সিংহ, রুশ পতাম এবং সিং ইয়ং ম্রো-কে অশেষ ধন্যবাদ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
গুলশান, ঢাকা

সূচিপত্র

বাংলাদেশের নানান ভাষা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৩ জুলাই ১৯৭৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর হয় : 'শ্রী লারমা : শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া (শিক্ষা বিভাগ) মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি—

'(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি পৃথক ভাষাভাষী চাকমা, মারমা (মগ), ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাকদের ভাষা উন্নয়নের জন্য সরকার কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি না; এবং

'(খ) (ক) প্রশ্নে উল্লেখিত দশটি ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি না; করিয়া থাকিলে, কবে হইতে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে; না হইলে, উহার কারণ কী?

'অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী : (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ প্রচলিত ১০টি ভাষা উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

'(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হেতু দেশের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার সম্পর্ক নিবিড় হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং একমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য জেলার মত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বাংলা ভাষার শিক্ষাদান করা হইতেছে।'

মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না।

ভাষার অধিকার দুই ধরনের হতে পারে। এক. ভাষাভিত্তিক কোনো বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার। এটি মূলত আত্মরক্ষার অধিকার। দুই. সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের অধিকার। এটি মূলত ভাব প্রকাশের অধিকার।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার এই দেশে নানা কাজে নানা স্তরে চালু আছে আরও অনেক ভাষা। সেসব ভাষা নিয়ে এই আয়োজন। ভাষাগুলো সম্পর্কে আলোচনা সাজানো হয়েছে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে।

আরবি

আরবি ভাষার জন্ম আরব উপদ্বীপে। এটি সেমিটিক ভাষা; আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষাগুলোর এক প্রধান অব-পরিবারের ভাষা। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। ধ্রুপদি আরবি কোরআন শরিফের ভাষা। এ ভাষা ১০ কোটির বেশি লোকের মাতৃভাষা। আরবি বর্ণমালা ডান দিক থেকে বাঁয়ে লেখা হয়। আরবি হরফ উর্দু ও সিন্ধি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এ ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর আফ্রিকায়।

আরবি বর্ণমালা

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। কয়েক দশক আগে গ্রামেগঞ্জেও যেসব আরবি শব্দ প্রচলিত ছিল, তাদের ব্যবহার এখন অনেক কমে গেছে। এখন আমরা ডিম বলতে 'বয়দা' বা 'বয়জা' বলি না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবি ভাষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্যে যে কয়েক লাখ বাঙালি কাজ করেন, তাঁরা চলনসই আরবি বলতে পারেন। আমাদের দেশে আরবি ভাষায় তেমন মৌলিক সাহিত্য রচিত হয়নি।

এ দেশে একসময় আরবি লিপিতে বাংলা লেখার কথা উঠেছিল। যাঁরা নামাজ পড়েন, তাঁরা দিনে পাঁচবার আরবিতে সালাত কায়েম করেন। শুক্রবারে জুমার নামাজ ও মৃতের উদ্দেশে জানাজা আরবি ভাষায় সমাধা করা হয়। বাংলাদেশের মক্তব-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা পড়ানো হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ হাজার আলিয়া মাদ্রাসা ও ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে।

কোরআন শরিফে ভাষাসংক্রান্ত দুটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরা রুমের ২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।'

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ
اَلْوَانِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

সুরা রুমের ২২ নম্বর আয়াত

সুরা ইবরাহিমের ৪ নম্বর আয়াতে আছে, 'আমি প্রত্যেক রসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি শক্তিমান তত্ত্বজ্ঞানী।'

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

সুরা ইবরাহিমের ৪ নম্বর আয়াত

ইংরেজি

সতেরো শতকের প্রথম ভাগেই বাংলা অঞ্চলে ইংরেজি ভাষার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত চার্লস উডের *এডুকেশনাল ডিসপ্যাচ*-এ বলা হয়, নিম্নস্তরে শিক্ষাদানের ভাষা হবে নিজ নিজ মাতৃভাষা, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হবে ইংরেজি। বঙ্গে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ১৭৮০ সালে জেমস হিকি প্রকাশিত *বেঙ্গল গেজেট*।

Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

ইংরেজি বর্ণমালা

ইংরেজির কেজো-ব্যবহার তো ছিলই, সেই সঙ্গে অনেক বাঙালি ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করেছেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলার মানুষ ইংরেজিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ঢাকার নবাব

শামসুদ্দৌল্লাহ্ (১৭৭০-১৮৩১) রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, অথচ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। নবাবের ইংরেজিতে সাহিত্যিক দক্ষতা ছিল, এ কথা বিশপ হেবার লিখেছেন তাঁর *ন্যারেটিভ অব এ জার্নি* (১৮২৭) গ্রন্থে। লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) ইংরেজিতে একাধিক বই লেখেন। সেসব লেখালেখি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তো ইংরেজিতে সাহিত্য রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। *দ্য ক্যাপটিভ লেডি* তাঁর উল্লেখযোগ্য ইংরেজি রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *রাজমোহনস ওয়াইফ* লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সৈয়দ আমীর আলী মুসলমান লেখকদের একজন, যিনি ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য বই : *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* (১৮৯১) এবং *এ শর্ট হিস্টরি অব সারাসিন্‌স্* (১৮৯৮)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাড়িতে শেখা ইংরেজির জ্ঞান নিয়েই *সুলতানাস ড্রিম*-এর (১৯০৮) মতো কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

আমরা যখন স্কুলে পড়ি, তখনকার সময়ে স্কুলের নাম ছিল মিডল ইংলিশ স্কুল আর হাই ইংলিশ স্কুল। 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯৯২' পাস হওয়ার পর বাংলাদেশে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবর মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষার পক্ষে জোরালোভাবে বলে গেছেন। তিনি নোবেল পেয়েছেন ইংরেজি ভাষায় *সং অফারিংস* (১৯১৩) রচনার জন্য। নোবেল পুরস্কারের জন্য সুইডিশ একাডেমিকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি যে টেলিগ্রাম পাঠান সেখানে নিজের কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি দেন :

> Thou hast made me known to friends whom I knew not.
> Thou hast given me seats in homes not my own.
> Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger.

সুইডিশ একাডেমিকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম

*গীতাঞ্জলি*র বাংলা সংস্করণে লাইনগুলো পাওয়া যাবে এভাবে :

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

ইংরেজিতে পাঠানো ধন্যবাদপত্রের বক্তব্য ধরা পড়েছে কবিতায়

উর্দু

উর্দু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় উপগোত্রের একটি ভাষা। দিল্লি ও তার আশপাশে প্রচলিত হিন্দি ভাষার সঙ্গে প্রায় দুই শতাব্দী (১২০০-১৪০০) ধরে ফারসি শব্দের মিশ্রণের ফলে উর্দু ভাষার জন্ম। এই মিশ্রিত বুলিকে ভাষাবিদেরা খাড়িবুলি, রিখতা ও হিন্দুস্থানি বলেছেন। 'উর্দু' তুর্কি শব্দ, যার অর্থ সৈন্য। মোগল সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৮-১৬৫৮) সেনানিবাসের নাম ছিল উর্দু-এ-মুআল্লা। শাহজাহান তাঁর সেনানিবাসের নামে এই ভাষার নাম দেন উর্দু।

কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় (১৭৮০) উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮০০) শুরু থেকেই বাংলা ও ফারসি বিভাগের মতো হিন্দুস্থানি বা উর্দু বিভাগ ছিল। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। কারণ তখন হাদিস, ফেকা, তাফসির প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রধানত লেখা হতো উর্দু ভাষায়।

ঢাকায় আধুনিক ধারায় উর্দু কাব্যচর্চা শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ দিকে। ঢাকায় এ সময়ে মির্জা জান তাপিশসহ অনেক উর্দু কবির সমাগম ঘটে। নবাব আবদুল লতিফের জামাতা সৈয়দ মুহম্মদ আজাদ (১৮৫০-১৯১৬) প্রথম উর্দুতে নাটক রচনা করেন। আহমদ হুসাইন ওয়াফির ছিলেন ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তাঁর রচিত নাটক *বিমার-এ-বুলবুল* (১৮৮০) সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭) উর্দু সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর লেখা *ঢাকা পঁচাস বরস পহলে* (১৯৪৯) এখনো বেশ সমাদৃত।

বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ লোক উর্দু ভাষায় কথা বলেন। এখানে বসবাসরত বিহারি কবি-লেখকেরা উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন। উর্দু ভাষার অগ্রগণ্য কবি নওশাদ নূরী আমৃত্যু ঢাকায় বাস করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে প্রথম উর্দু

কবিতাও তাঁরই রচনা। ১৯৫২-এর এপ্রিলে করাচির উর্দু সাহিত্যপত্র *আফকার*-এ কবিতাটি ছাপা হয়। 'মহেঞ্জোদারো' শিরোনামের সেই কবিতায় তিনি লেখেন :

> বাংলা সাহিত্যের দৌলত আজ বিপন্ন
> হানাদারেরা এগিয়ে আসছে—
> পত্র, প্রস্তর, চর্ম, প্যাপিরাস,
> তাম্র ও কাংসপত্রে সংরক্ষণ করো
> বাংলার মূল্য ও চেতনাকে।
> কারণ সেই অশুভ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।
> যা নগরকে উল্টে-পাল্টে দেয়
> এক মৃতের স্তূপে।

এখানকার উর্দু-ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ঢাকার নবাব খাজা পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। উনিশ ও বিশ শতকে এই পরিবারের খাজা হায়দার জান, খাজা আসাদউদ্দীন কাওকাব, খাজা আবদুর রহিম সাবা, খাজা আহসানুল্লাহ শাহীন, খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুতে সাহিত্য চর্চা করেছেন।

ব্রিটিশ আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উর্দু পত্রিকা *আল মাশরিক* (১৯০৬-১৯০৭) ও *জাদু* (১৯২৩)। পাকিস্তান আমলেও একাধিক উর্দু পত্রিকা বের হতো। এর মধ্যে *ওয়াতন* (১৯৪৭) ও *পাসবান* (১৯৪৭) উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ স্কুল-কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিনে একটি উর্দু বিভাগ থাকত।

বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার বহির্বিভাগ উর্দু ভাষায় খবর প্রচার করে। এখন আর সেভাবে মুশায়রা অনুষ্ঠিত না হলেও বাংলা ও উর্দু গজলের চর্চা রয়েছে।

موہنجوڈارو

ہوسکتا ہے، کوئی طوفاں
ہوسکتا ہے، کوئی دریا
ہوسکتا ہے، کوئی فاتح
ہوسکتا ہے، کوئی لٹیرا
شہرِ تمدن دھول کے نیچے
دھول کے نیچے بولی بھاشا
اور اے تاریخ نویسو!
لوگ کہیں مُردوں کا ٹیلا
کوئی وبا تو پھوٹی بھی
کوئی بلا تو ٹوٹی بھی

میرے شہر کے رہنے والو!
اپنی پوتھی، اپنی گیتا
اپنی اپنی لوک کتھائیں
اپنی اپنی گیتی مالا
اپنا اپنا حرف تہجی
اپنی اپنی بولی بھاشا
پتے، پتھر، پوست، پپائرس
تانبے، لوہے پر لکھ رکھنا
وہی وبا پھر پھوٹی ہے
وہی بلا پھر ٹوٹی ہے

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পক্ষে লেখা প্রথম উর্দু কবিতা 'মহেঞ্জোদারো'

ককবরক

ত্রিপুরা জাতির ভাষার নাম ককবরক। 'কক' মানে 'ভাষা'। আর 'বরক' মানে 'মানুষ'। এই দুয়ে মিলে 'ককবরক' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'মানুষের ভাষা'। ককবরক ভোট-চীন পরিবারের তিব্বতি-বর্মি উপপরিবারের ভাষা। এ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। ককবরক ভাষায় দুই ধরনের লিপিতে লেখার প্রচলন আছে—রোমান ও বাংলা। ককবরক ভাষা এই দুই লিপির কোনটিতে লেখা উচিত, তা নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক আছে। পৌষ, ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৭-৯৮ খ্রি.) ককবরক ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন দৌলত আহম্মদ মজুমদার (১৮৬৪-১৯৪৪ খ্রি.)

বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় ১০ লাখ ত্রিপুরা ককবরক ভাষায় কথা বলে। মধ্যযুগে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী-শাসিত পূর্ববঙ্গের এক বিশাল এলাকায় ককবরক প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরাদের অবস্থান তৃতীয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এদের জনসংখ্যা ৭৯ হাজার ৭৭২ জন। টিপরা ও ত্রিপুরা একই জনগোষ্ঠী। ত্রিপুরা জাতি মোট ৩৬টি গোত্রে বিভক্ত। বাংলাদেশে ১৬টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে উপভাষা-ভেদ রয়েছে।

অনেক আগে থেকেই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরক ভাষা বাংলা হরফে লিখিত হয়ে আসছে। ককবরকের ব্যাকরণ অনেক পুরোনো। প্রায় ১০০ বছর আগে এই ব্যাকরণ রচিত হয়েছে।

আর সবার মতো ত্রিপুরাদেরও আছে তাদের মাতৃভাষা ককবরকের জন্য অনুরাগ। একটি ককবরক কবিতায় ধরা পড়েছে মাতৃভাষার প্রতি কবির অকৃত্রিম দরদ :

ককবরক অংখা, চিনি আমানি কক্
ই ককনী হামজাকাদি, ঔ বরকরক।

আমানি খুরিয়ে, আং চারাই ফু আঁ
আমা সানাই কক্ খানাকা পৈলাআঁ
জৗতনি খানাতক আমানি কক্
মানৗ কসল হামজাকদি নক ॥
বীসাক তেঁত্রফুআঁ আমানৗ রিংয়
কাইসা বাই বুজাকফুআঁ আমানৗ রিংয়
আমা জৗতনি গারা, ইম দাইজ্য কক্
ইঁ ককবরনৗ হামজাকদি নক ॥
ককবরক বাই বিসিনি সালতালনৗ,
সিনানি নাইদি তিপ্রা জাতিনি ককনৗ
রাচাদি, চিঠি সুইদি ইঁ কক বাই নক
আইক্যাং খালাইদি আঁ তিপ্রারক ॥

অর্থাৎ,

ককবরক মোদের প্রিয় মাতৃভাষা,
এ ভাষাকে ভালোবেসো হে জনগণ ॥
মায়ের কোলে থাকি শিশুকালে যখন
মায়ের মুখে শুনি এ ভাষা প্রথমে তখন ॥
সবার সেরা মোদের প্রিয় মাতৃভাষা,
সকলেই ভালোবেসো মায়ের মতন।
অঙ্গ ব্যথা হলে যবে মাকে ডাকি,
কেউ প্রহারিলে মা'রে বলতে থাকি ॥

ককবরক ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার আকুতিও রয়েছে ত্রিপুরাদের মনে। ভাষার যেসব দিকের প্রতি এখনো বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি সেদিকে লক্ষ্য করে একজন ত্রিপুরা কবি 'ত্রিপুরাগণ'-এর প্রতি আবেদন রাখছেন :

ককবরক বাই বিসিনি সালতালনৗ,
সিনানি নাইদি তিপ্র জাতিনি ককনৗ
রাচাদি, চিঠি সুইদি ইঁ কক বাই নক
আইক্যাং খালাইদি আঁ তিপ্রারক।

বাংলায় :

ত্রিপুরাদের দিন, মাস তারিখ গণনা,
ত্রিপুরা ভাষায় কি তা কেউ জানে না
গান গেয়ো, চিঠি লেখো দিয়ে মাতৃভাষা,
অভ্যাস করতে থেকো ওহে ত্রিপুরাগণ।

খাসি

বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্ত-সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসরত মঙ্গোলয়েড খাসিয়া বা খাসি জাতির ভাষার নাম খাসি ভাষা। এই ভাষার স্থানীয় নাম খাসিয়া। খাসিয়া নৃগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড হলেও খাসি ভাষা অস্ট্রিক মোন্-খ্মের গোত্রের অন্তর্গত। বাংলাদেশে বর্তমানে খাসিয়াদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে এ সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২৮০। ভারতের মেঘালয় ও আসাম রাজ্য মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ লোক খাসি ভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী খাসি ভাষার সঙ্গে মিয়ানমারের মোঁয়ে, পলং এবং উপমহাদেশের তালাং, খেড়, সুক, আনাম, খামেন, চোয়েম, ক্ষং, লেমেত, ওয়া প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর ভাষার মিল লক্ষ করেছেন। খাসি ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি নেই। ১৮১২ সালে খ্রিষ্টীয় ধর্মযাজক কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রথম বাংলা বর্ণমালাতে খাসি ভাষায় *নিউ টেস্টামেন্ট* অনুবাদ করেন। ১৮৩৮ সালের পরে ওয়েলস মিশনারি দলের টমাস জোনস রোমান হরফে খাসি ভাষা লেখার প্রচলন করেন। বর্তমানে খাসি ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়। বাংলাদেশের খাসিয়াদের মধ্যে অনেকে এখন বাংলা লিপিতেও খাসি ভাষা লিখছেন। খাসি ভাষার উপভাষা রয়েছে বেশ কয়েকটি। লিঙ্গামকে এই ভাষার ঔপভাষিক বৈচিত্র্য বলে মনে করা হয়।

খাসি ভাষায় খুব বেশি সাহিত্য রচিত হয়নি। চাকমা বা মণিপুরিদের সঙ্গে তুলনা করলে একে অপ্রতুল বলা চলে। খাসি ভাষার কবি রুশ পতামের একটি কবিতার নাম 'জিং ইম হা লুম' বা 'অরণ্যে স্নিগ্ধ জীবন'। দীর্ঘ এই কবিতায় খাসিয়াদের রোজকার জীবনের একটি ছবি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে পাওয়া যায় গভীর দেশাত্মবোধ।

জিং ইম হা লুম

হা কেনথং লুম কি সেং কা শ্নং
হা নংকেনডং কেনজাই কি শং।
না পেনেহ মারিয়াং ই মেই রামেউ
ব্রী সহ ব্রী কোয়াই কি থুং টৈমপেউ
উ ডিং উ সীজ কি রি সুমার
বানভা কা রেপ উ নিয়ুট কি সার।
ডাং স্টেপ ফেরঙাপ কি ফেট শা ব্রী
কি সং উ কোয়াই কা ওয়াইট টারী।
উ ছট কি কিয়াং লেনটি বা জেঙাই
কি স্টেট কি ইয়াইড বান ওয়ান ডিংশাই।
হা ট্রেপ সংথাইট টৈমপেউ তাহ শুন
জ্রাপ জ্রাপ বাম কোয়াই কা কাম বা বুন।
মেন্ত্রি ছেত্রী, রংবাহ রংসান
উ শং পেরখাট, উ সাইন কি আইন।
কা শ্নং কা থাউ বান রয় বান পার
কি খিহ কি খান, কি রী করবার
উ পাইড উ ফিয়াং উ শং সুকি
কি লাং দরবার তাং খট ইয়াকি।

কো রি বা ইজ খুবলেই ইয়াফা
কুমনো ঙান ক্লেট জিংবাং জংফা
রীথর রীলুম লং কিসিয়ার রুপা
ডিংসীজ কেনবাট বা ডাপ পুড়া
কো রী কি ক্রি কো রী কি ক্পা
কেরখু কা ইয়িং লংকুর লংখা।

হেনডাই লাউবাহ কি ডা কি ব্সা
কেনরহ মাওইট কিন তামাসা।
কি খ্লাউ কি ওয়াহ নাং হিয়ার নাং ত্লর
জিংডুম লা তাপ জিঙ ইম লা ত্লর
লাউ টাং লাউলুম, ইয়াথুহ ইয়াঙি
হাংনো ঙিন হের, হাংনো ঙিন জেংঙি

কো থেম সুরমা কো ওয়াহ্ উমঙট
থেহ বিয়াং উম কিসিয়ার টৈলং তো শট।
কো লেএর বাতেমন তো আই জিংসাই
তো ওয়ান হাণ্ডি ওয়াট ফেট শা জেঙাই
উন কেরহুহ উ লাবাসা উন রিনসিড উ কাইরাং
শা শিসিন পাট কি সীম কিন ক্লাং।

কবির বাংলা ভাষান্তর :

অরণ্যে স্নিগ্ধ জীবন

ওই উঁচু পাহাড়ের গায়, গড়ে বসতভিটে
পল্লির নীরবতাই সুখের জীবন
প্রকৃতির ছায়ায় সুশোভিত মাটি মাতা
ফলজ গুয়া বাগান আর পান বরজ রোপণ।
প্রকৃতি গাছপালা অতি সযত্নে করি লালন
চাষাবাদে ঝাড়ঝোপ করি ঝাড়ন।
ভোরে জেগে উঠে চলি পানখেতে
পান সুপারি, দা-টারি সাথে
কাঁধে ছুট খাড়া অতি দ্রুত যেতে হবে দূরে
ফিরতে হবে আঁধার নামার আগে
খেত আর কুঁড়েঘর আনন্দ আয়েশ
তাড়া করি কাজ পান-সুপারি চিবিয়ে।
মন্ত্রী ক্ষত্রিয় পল্লি গুরুজন
ব্যস্ত আইনকানুন জন সুশাসন
জনগণ উপার্জন আর পল্লি-উন্নয়ন
শ্রম আর শ্রমে শান্তি সকল সময়।
সব সাধারণ সুখে শান্তি সন্ধানে
নিসর্গ পল্লি সভাসদে মুগ্ধপানে।

প্রিয় জন্মভূমি, তোমার আশীর্বাদ
প্রতিদিন স্মরণে তোমার সুমিষ্ট দান
সমভূমি পাহাড় অরণ্য সোনা-রুপার দেশ
গাছ বাঁশ ঘাস লতা-গুল্ম গুচ্ছ সমাহার।

আত্মীয় স্বদেশ জ্ঞাতি বংশীয় ভূমি আমার
আশীর্বাদ বর্ষিলে মোর স্বজাতি-স্বজনে।

আদিতে অরণ্যাদি মোদের করত রক্ষা
এখন ইট-সুরকি গাঁথুনি রুখিবে কিসে
প্রকৃতি বন নদ-নদী শুকিয়ে কঙ্কালময়
ঘন অন্ধকার জীবন হতাশামগ্ন।
হে অরণ্য, বলে দাও আমায়
কোথায় ডানা মেলি কোথায় তোমায় পাই।

হে সুশোভিত সুরমা, হে সুপেয় উমঙট নদী
আবার স্বর্ণজল দাও, আবার ঝরনা ঝরো
হে সু প্রশান্তি বাতাস, হে জোছনাময় চন্দ্রমণি
তোমরা আবার এসো, মোদের প্রাণ জাগাও।
গর্জে উঠবে বাঘ, ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়াবে হরিণী
আবার গাইবে পাখিদল সুমধুর গান।

গারো

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, মধুপুরের গারো পাহাড়ঘেঁষা অঞ্চল ও সিলেটে গারো বা মান্দিদের বসবাস। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অনুসারী মান্দি নৃগোষ্ঠীর ভাষার নাম 'আচিক' বা 'মান্দি'। গারো ভাষা তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর 'বোড়ো' উপপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মান্দিদের মোট ১৩টি গোত্রের মধ্যে বাংলাদেশে সাতটি গোত্রের কথা জানা যায়। গোত্রভেদে মান্দিদের আলাদা আলাদা উপভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। এ ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। জন থুসিন রিসিল, ডানিয়েল আর রুরাম, মার্টিন রেমা, প্রদীপ সাংমা—এই চারজন গবেষক আলাদা আলাদা গবেষণার মাধ্যমে চার ধরনের বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। এ ভাষাটি লিখতে বর্তমানে প্রধানত রোমান এবং সীমিত পর্যায়ে বাংলা হরফের প্রয়োগ হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় মঙ্গোলীয় গারো-বোড়োভাষীদের প্রায় সবাই তাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলায় কথা বলে। এরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে গারো ভাষায়। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে বাংলা ব্যবহার করে।

গারো ভাষার রয়েছে এক বিপুল মৌখিক সাহিত্যসম্ভার। গারো সাহিত্যে আছে রূপকথা, লোকগাথা, প্রবাদ-প্রবচন, গান, কবিতা, ছড়া, উপকথা, কাহিনি, ধাঁধা ইত্যাদি। সৃষ্টিতত্ত্ব, পূজা-পার্বণ, চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-মাটি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ভাষায় বিচিত্র কাহিনি গড়ে উঠেছে। মৌখিক সাহিত্যের পাশাপাশি গারো ভাষায় লিখিত সাহিত্যেরও চর্চা হচ্ছে। মতেন্দ্র মানখিনের গারো ভাষায় রচিত একটি কবিতায় ঐতিহ্যের প্রতি কবির অনুরাগ ও পিছুটান লক্ষ করবার মতো। কবি মতেন্দ্র মানখিন বলছেন :

মান্দি খুরাং

আইয়াও খাসাদিকদিক সাকসান থাংথাং
মান্দিরাফাজা। আমাগ্রি সিকদিকদিক
বিমাং বিচং গিম্মারুরায় বন চিপজকসা
আনথাংনি খাথা খুরাংরাং
খিন্নাথুয়া রাসং চাআনি ফাগিৎচামরাংনি
আগান মিয়াফারাং গিম্মা রুরাগিপা
আসলগেখান নিকস্রাংজাজাকসা।
'চীন-তিব্বত, বার্মা, জাবা, ইন্দোপাকনি
থিংনা পগিপা ব্রিং আবৃ-আখলত্ত
স্খাং চেংওনি থারিগিপা চাসং নিচাসং
খঅমা খুরাং রাংখো রাখিনা মানজাজক।
আং গিসিক নিংও সিকদিকদিক সেরেনজিং
গ্রাপেংআ। মিকচি রুরা রুরা কংশ, নিতাই
সোমেশ্বরী বালস্রাতা মান্দি রাংনি
হাজিয়া দরুয়া রেরে।
বিবাল গিত্তা খুরাং দাকবেওয়াল দাকমেশোকা
নাম্মেণ দুক, আরও গিসিক সানি হংসা।
আংআগে দাআওনি সাল থেকথেক
ওয়া বাগামখোন থারিখোজা

কবির নিজের বাংলা অনুবাদে :

গারো ভাষা

অসহায় বোধের ঘরে আদি-উপজাতি
অনাথ তুমি অবহেলিত।
বিমাতাসুলভ সময়ের জীর্ণদশা
অবলুপ্ত প্রায় নিজস্ব দীপ্তি তোমার
বিকশিত রূপ, সুন্দর ভাষা অলংকার
যেটুকু আছে শিল্প-মাধুরী, ছন্দ-সুষমা
পৌরাণিক সুকুমার চর্যা, মলিন ভাস্কর্যের
আদিরূপ আমি দেখি নাই।
চীন-তিব্বত-বার্মা পেরিয়ে উপমহাদেশের
দুর্গম পাহাড় অরণ্য, গুহাগাত্রের শিলালিপি

চিৎ-প্রাকর্ষিক যুগের পরম্পরাগত মৌখিক
গল্প-গাথা আমি তো রপ্ত করতে পারিনি।
আমার বুকের ভেতর ভাষাহীন মূক
সেরেনজিং কাঁদে। অশ্রুধারায় বিগলিত
কংস, নিতাই, সোমেশ্বরী।
উৎসারিত হয় গারো লোকগীতি
হাজিয়া, দরুয়া, রে রে।
ফুলের মতো বিকশিত হতে চায়
আমার নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি।
বড় দুঃখ, বড় কষ্ট, বড় লজ্জা
আমি তো সেই বাগান গড়িনি আজও।

ফরিদ জাম্বিলের একটা দেশ গড়ার গান :

আ. সং থারিয়ানী
বাংআ জা. বিটছিম দু'কনি সাগাল বালজ্রোয়ে
রেবাজক চিংআ দা'আলো সেংআ আঃসাকোনা
বাংলা বুগুগ্রীম, আবৃ-ক্রু রামাখো রি'য়ে
সকবাজক চিংআ দা'আলো রামা গি.ত্তালোনা ॥

সেইগেন দা'আলো গিত্তাল কথক মান্দে সালরাং
আইয়াও ইন্নে খা-ফাগেন আ'গিল সাকনি মান্দেরাং
রেবাবো দা'আলো গ্রীম দা'কে খা'দং আনি গীতখো রিংনা ॥

কংস নিতাই আরো সিমসাং চি'ভিমা
ঝিপ্‌জাং, ঝিপ্‌জাং রেয়া আনসেং রি রি হা
খেননানি মামুং দংজাজক দা'ল জাজ্রেংআনি
আস্কি ড. মি নাজক উয়া চাসং গিত্তালনি
মেশোকগেন রামাগো উয়ান ব্রাংগিপা মান্দেরাংনা ॥

কবি নিজেই এর বাংলা অনুবাদ করেন :

দেশ গড়ার গান
অনেক আঁধার আর দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়ে,
আমরা এসেছি আজ আলোর ভুবনে।

অনেক বাধা আর বন্ধুর পথ পেরিয়ে
আমরা পৌঁছেছি আজ নতুন পথের সন্ধানে ॥
লিখবে এখন নতুন ইতিহাস জ্ঞানী-গুণীজন
অবাক হয়ে শুনবে তাহা বিশ্বের জনগণ।
এসো আজি সবে মিলে ভরি হাসি আর গানে ॥

কংস, নিতাই আর সোমেশ্বরী নদী,
আনন্দে মাতাল হয়ে বহে নিরবধি
নেই কোনো ডর আজ নেই কোনো ভয়
নব যুগের ধ্রুব তারা হয়েছে উদয়
দেখাবে ওই পথের দিশা পথহারা জনগণ ॥

চাক

বাংলাদেশে চাক জনগোষ্ঠীর বসবাস মূলত বান্দরবান জেলায়। এ ছাড়া মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যেও তাদের বসবাস রয়েছে। চাকদের ভাষায় 'চাক' শব্দের অর্থ 'দাঁড়ানো'। চাকরা নিজেদের নামের শেষে চক লিখলেও আরাকানিরা চাকদের 'সাক' (Sak) এবং কখনো কখনো 'মিঙচাক' বলে ডাকে। চাকরা অবশ্য নিজেদের বলে 'আচাকঃ'। বাংলাদেশে চাকদের সংখ্যা ২ হাজার, মিয়ানমারে ২০ হাজার (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০২)। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে বাইশারি, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিখ্যং, কামিছড়া, কোয়াংঝিরি, ক্রোক্ষ্যং প্রভৃতি জায়গায় চাক জনগোষ্ঠীর বসবাস আছে।

(ব্যঞ্জনবর্ণ)

(স্বরবর্ণ)

চাক বর্ণমালা

নামগত সাদৃশ্য ছাড়া চাকমাদের সঙ্গে এদের ভাষা বা সংস্কৃতিগত কোনো মিল নেই। চাকরা মূলত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তবে অনেক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীও আছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকদের মধ্যে প্রধানত দুটি গোত্র দেখা যায়: আন্দো ও ঙারেখ। এই দুটি প্রধান গোত্রের মধ্যে আবার অনেকগুলো উপগোত্র আছে। একই গোত্রের মধ্যে ছেলেমেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ।

চাকরা যে ভাষায় কথা বলে সেটি চাক ভাষা নামে পরিচিত। এ ভাষা চিনা-তিব্বতি পরিবারের সদস্য। জর্জ গ্রিয়ারসনের মতে, মণিপুরের আন্দো, সেংমাই এবং বাইরেল উপভাষার সঙ্গে চাক ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, এই ভাষা চিনা-তিব্বতি ভাষা-পরিবারের সাক-লুইশ গোত্রভুক্ত। যদিও কেউ কেউ এটিকে অশনাক্ত ভাষারূপে চিহ্নিত করেছেন। চাক মূলত টোনাল বা সুরপ্রধান ভাষা। এই ভাষার বাক্য গঠন বাংলার মতোই। অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। যেমন: বাংলা 'আমি ভাত খাই', চাক ভাষায় 'ঙা পুক সেহে'। বাংলার সঙ্গে চাক ভাষার আরও কিছু মিল আছে। বাংলার মতো চাক ভাষাতেও বহুবচনে 'রা' প্রত্যয় যুক্ত হয়।

দৈনন্দিন ব্যবহারের পাশাপাশি চাক ভাষায় সাহিত্যচর্চাও হচ্ছে। আধুনিক চাক ভাষায় রচিত মং শোয়ে চিং চাকের (Mong Shwe Ching Chak) একটি কবিতা রোমান হরফে দেওয়া হলো:

Kruik lunga pain
Chik-Aa-Hrago nangan-unga
Anga-ungchinga ochipiga chakta paikolung
Brungni rigoh lunghe nang.

Unga ungchinga paindangcha akabang rigo.
Chiktahung unga roipiheka chakku wak.
Nalang gehek fakta kanhigok.
Unga khoigo lunglung gere
Unga khoigo lunglung gere
Abailangbo unga kanha Tongfok moong

Pain bagang anga tokcringo hing hry hry rigo.
Ateyrang ungungaihek nanga minga lago
Thu go anglang hek unga ungchching pik Aa.
Nanga-mik nanga ma bik.

Yak unga frike kinike Sahara chelebrang.

Ungo sekalang nying kanhangfucha ukfangah
Yak nanga-ming unga-tukko sak ko ogele
Obainainga pryinggo nango aakra.

Aakonga se gayok asebok hragayok ahrabok
Aama hekpraaching pikaga hruhekka
Aakonga chikonga fregawalk aachego olahe
Unga kaching tahuing roigo pinak hek kobita.

কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ থেকে আমি বাংলা করেছি :

ঝরা ফুল
আমি চেয়েছিলাম
চিরদিন তোমাকে আমি হৃদয়ে রাখব ধরে
কিন্তু তুমি চলে গেলে
আমার হৃদয় ফুল ও পাখি-শূন্য করে

আমার স্মৃতির অ্যালবামের পাতাগুলো
জমা থাকবে আমার হৃদয়ে
তুমি যখন আমাকে বিদায় দিয়েছিলে
দখিনা বাতাস গেয়েছিল মোর কানে
রাতের বাগান ভরে ছিল বুলবুলের গানে
সুরেলা স্বরে যে নামে তোমার নাম গেয়েছিল
তোমার সেই চোখ, সেই মুখ
আমার হৃদয়ের প্রতিটি পাতায় আঁকা।

আজ আমি সাহারা মরু
তুমি বেছে নিয়েছ সোনার মই
আমি তোমায় ডাকছি দীর্ঘ চিৎকারে
আমার কানে শুধু 'না' শব্দ যে বাজে

আজ আমি বুঝেও বুঝি না
আমি তোমাকে জেনেও জানি না
আমার দীর্ঘ বেদনার এ কান্না
তোমার স্মরণে আমি
আমার কাঁচা হাতের লেখা কবিতাটাই তুলে নিলাম।

চাকমা

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা ও অবস্থান বিচারে চাকমা বা চাঙমা উল্লেখযোগ্য। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, আসাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে বাস করে। এ ছাড়া চাকমাদের একটি শাখা মিয়ানমারেও রয়েছে বলে জানা যায়। এরা মূলত দইংনাক নামে পরিচিত। চাকমারা নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয়, কিন্তু তাদের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমা ছাড়া একমাত্র তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা এ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

𑄇 𑄈 𑄉 𑄊 𑄋
𑄌 𑄍 𑄎 𑄏 𑄐
𑄑 𑄒 𑄓 𑄔 𑄕
𑄖 𑄗 𑄘 𑄙 𑄚
𑄛 𑄜 𑄝 𑄞 𑄟
𑄠 𑄡 𑄢 𑄣 𑄤
𑄥 𑄦 𑄃 𑄄 𑄅
𑄆

চাকমা বর্ণমালা

প্রায় সকল ভাষাতাত্ত্বিক চাকমা ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জর্জ গ্রিয়ারসন চাকমা ভাষাকে ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর

প্রাচ্য শাখার দক্ষিণ-পূর্বী উপশাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি চাকমা ভাষাকে বলেছেন 'ব্রোকেন ডায়ালেক্ট অব বেঙ্গলি'। তিনি আরও বলেছেন, পরবর্তীকালে 'এই ভাষা এত দূর পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে একে পৃথক ভাষা বলা যেতে পারে।' ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে চাকমা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্যের সঙ্গে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্যের পার্থক্য থাকলেও অসমিয়া ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

চাকমা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। চাকমা হরফগুলো অনেকটা বর্মি বা খেঁর লিপির মতো। চাকমা লিপিতে লিখিত নানান পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ *আঘর তারা*। ১৮৬০ সালে প্রথম খ্রিষ্টান মিশনারিরা এলাহাবাদের একটি প্রেস থেকে চাকমা লিপিতে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। নোয়াবাম চাকমা ১৯৫৯ সালে বাংলা ও চাকমা বর্ণে *চাকমার প্রথম শিক্ষা* নামে একটি শিশুপাঠ্য বই রচনা করেন। চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অনেক আগে শুরু হলেও চাকমা বর্ণমালার ব্যবহার বা প্রচলন মোটামুটিভাবে সীমিত।

চাকমাদের অনেকেই এখন নিজের ভাষায় কবিতা লিখছেন। এসব কবিতার মধ্যে চাকমা ঐতিহ্য ও জীবনপ্রণালি সুন্দরভাবে এসেছে। চাকমা ভাষার কবি জগৎ জ্যোতি চাকমার 'বিযু লিরিক' কবিতার কয়েকটি লাইন পড়া যাক :

বিযু এলে ঝাগেঝাক মিলি গাঙত যেবং
গোঝেনর উধিজে এগামনি ফুল-পাগর ভাজেবং।
পিনন-খাদি পথম পিনি, হাত জানং ন জানং গরি,
মনাননত লোইনেই রাঙা গাভুরান আদামর পথান ধরি।
জিংকানির পোইলে রঙান ইরিদি আদাম বেড়েবং।
বিযু এল ঝাগেঝাক মিলি গাঙত যেবং।
গাভুর লগে রিনি চেবাক, আমক চোখে আমক হোয়নেই;
পাত্তা না' পেই কুজোক অবাক, আমা দেমাক দেই নেই।
মাধা উজু গরি আমি বেগে গজাং গজাং হ্যাদিবং।
বিযু এল ঝাগেঝাক মিলি গাঙত যেবং।
বজরর পথম দিনোত সাজন্যে কিয়ঙত যেই
বাত্তি আঙেবং সুরগরি গোজেনইদু বর মাগিনেই।
শুদ্ধসাঙ্গ হোয়নেই আমি ঘরত ফিরিবং।
বিযু এল ঝাগেঝাক মিলি গাঙত যেবং।

কবির বাংলা অনুবাদ :

বিজু এলে সবে মিলে যাব মোরা নদীতীরে

ফুলের ডালা ভাসাব স্রষ্টাকে উদ্দেশ করে।
প্রথম পিনন-খাদি পরে হেঁটে বেড়াব অদক্ষ পায়ে
রাঙা যুবতীরে বুকে লয়ে উঁচু-নিচু পথ বেয়ে;
জীবনের প্রথম রং ছড়িয়ে যাব গ্রামে গ্রামান্তরে।
হতবাক চোখে তাকাবে যুবকেরা আমাদের পানে
পাত্তাই দেব না বড়! হবে হোক তিক্ত-বিরক্ত মনে মনে।
শির উঁচু করি খুব উদাসীন হেঁটে যাব দ্রুত লয়ে।
বছরের প্রথম দিবসে কিয়াঙে গিয়ে সন্ধেবেলা
প্রদীপ জ্বালাব সবে মিলে প্রার্থনা করি খোলামেলা;
পরিশুদ্ধ হয়ে ফিরে যাব ঘরে, তারই পরে।

শিশির চাকমার বর্ণমালার কবিতা :

ম' আওজর অরক
পুগেদি রাঙা চিক চিক বেলানে মুয়ন দেগেল
হুয়োচাক পল্লাপল্লি খারা এবা দের
দ্বিবে এক্কো পেগর হোলরব।

রাঙামাত্যার কালা পিচ গচ্চে পধত
কালা ধুমো আ পরা তেল বাচ নিগিলেই
অসাগচ্য টেক্সীর উযোন লামনে কান নিবুলি
দ্বিবেতিন্নো গুরো লগে, আমি কয়েকজন
গুরোউন হাদত তাজা ফুলছড়া
আ' আমা একজন হাদত ফুলে পাগোরে
সাজেইয়্যা কুলো পারা এক ফুলোচাক
আমি যের শহীদ মিনারর অজার উদোনত।
শহীদ মিনারর ধুজিত অজার বরগাং, ঈনজিব
হাক্কন পর রোদ সদক পোরি, বরগাং তুবোলুন গত্তন বিগিদি।

ফুলে ফুলে শহীদ মিনার সাজি আগে ফুল পরি
সালাম রফিক জব্বার দাগির মোন দগ অযল আত্মাআনি
ভরন বিরোন পূর্ণিমার পহ্‌র গদ পোরি আগন ফুলর বিচ্ছ্যেনত
আমার ফুলর কুলোআন গজানার সমারে সমারে
শহীদ মিনারর চেরো মিক্কেত্তুন আমা অরক্কুন
লাজাং লাজাং ডরাং ডরাং গোরি নিগিলি কি যেন কবার চান

কয়েক্কো অরক নিলোজ গোরি ফুলো কুলোআন
চুমোদন, হিরব্যা গত্তন নিআলঝি।
তারা কুত্তুন এলাক আবাদাগোরি
এধক ভিলোন তারা এলাক শ্রীধাম বৈদ্য, চন্দ্রহরি বৈদ্য
ভগবান বৈদ্য আ সূর্যসেন বৈদ্য দাগির তেলকজরা
কজ্জালত।
শ্রীধাম বৈদ্য লুগি যেইয়্যা
চন্দ্রহরি বৈদ্য লুগি যেইয়্যা
তারা ফেলে যেইয়্যা কজ্জালত কয় দিন আর
সারাল্যা গোরি পোরি থেবাক কার বেইনজেবে
জু পেই তারা এচ্চে এচ্চোন জব্বার দাগির আত্মাউন
সমারে এগত্তর অবার।

মুই দিককাবুলো, তবব্
তারারে ফুজোর গোরিবার পরানে কয়য়্যা
খালিক ফুজোর গোরিবার আ' মাদেবার মত্তুন দ' সে মুয়ন নেই
হাক্কন পর বরগাং সাক্ষী রাগেই
ফুয়াঙ গুজুচ্চে আবাজ উধিল
হাজার হাজার অরক মাদি উধিলাক
আমি কি ফিরি যেবং
এযেত্তে বজর এ অক্তত কি আর' এবং
ভগবান বৈদ্য আ' সূর্যসেন দাগির কজ্জালত আর
কয়দিন আমারে রাগেবা।

শহীদ মিনারর ধূজিত পুরানা কাজিরা ঘরান
গিরগিরেই উধিল
কায় কুরর মানুচ্চুন লরিচরি উধিলাক
বরগাং ফুলি ফুলি উধিল
আমি কন' জুয়ব ন' দিলং
আমি জুয়ব দিলেঅ তারা কি
আমা বিরবিচ্চে খচখচ্চে বিজোল
আত্তবো মেল্লে হাদ্‌ত কি উধিবাক
শহীদ মিনার পিচ্চে ফেলে এলোং
কার চোগ ভিজিল নেনা, কেউ চোগ পুজিলাক নেনা
কার' ঈদোত কি ধুমুলুক খেলিল

ঠাহ্‌ার গোরি ন' পাল্লুং
হাক্কন পর লাহ্‌রে লাহ্‌রে
আমি তানা হিচ্চে জিরান নেই পধত
তেল ডিজেলের পরা বাজর নগ্‌রত মিজি গেলং।

কবির নিজের বাংলা অনুবাদ

আমার প্রাণের বর্ণমালা
সকালের আকাশে লাল সূর্যের ঝিলিক
কুয়াশার ভেলা লুকোচুরি খেলা ছেড়েছে
দু-একটি পাখির কিচিরমিচির শব্দ।

রাঙামাটির কালো পিচ করা পথে
কালো ধোঁয়া আর পোড়া তেলের গন্ধ বের করে
অসংখ্য ট্যাক্সি চলাচলের শব্দে কান ঝালাপালা
কয়েকটি শিশুসহ আমরা কয়েকজন
শিশুদের হাতে তাজা ফুল
একজনের হাতে ফুল আর পাপড়িতে সাজানো পুষ্পার্ঘ্য
আমরা যাচ্ছি শহীদ মিনারের পাদদেশে
শহীদ মিনারের পাশে নীরবে বহমান কর্ণফুলী
কিছুক্ষণ পর হালকা রোদের উষ্ণতায় কর্ণফুলীর ঢেউগুলো নেচে উঠছে।

ফুলে ফুলে শহীদ মিনার ভরে গেছে
সালাম রফিক জব্বার বরকতদের পাহাড়সম উঁচু আত্মাগুলো
নিপুণ পূর্ণিমার আলোর মতো আছে ফুলের বিছানায়
আমাদের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের সাথে সাথে
আমাদের বর্ণমালাগুলো সলাজে বেরিয়ে এল
তারা কী যেন বলতে চায়।

বর্ণমালাগুলো পুষ্পার্ঘ্য ঝোলাটিকে চুমো দিচ্ছে
ভালোবাসার ছোঁয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রাণের একাগ্রতায়
হঠাৎ তারা কোথা থেকে এল?
এত দিন তারা ছিল শ্রীধাম বৈদ্য চন্দ্রহরি বৈদ্য
ভগবান বৈদ্য আর সূর্যসেন বৈদ্যদের
পুরোনো তেল চিটচিটে ঝোলার ভেতরে।

শ্রীধাম বৈদ্য আর চন্দ্রহরি বৈদ্য হারিয়ে গেছে
তাদের ফেলে যাওয়া ঝোলায় কত দিন
আর পরে থাকবে অবহেলায় উপেক্ষায় বঞ্চনায়
আজ একটু সুযোগ পেয়ে তারা বেরিয়ে এসেছে
জব্বারদের আত্মার সাথে একাত্ম হতে।

আমি নিথর, হতবিহ্বল
তাদের সম্বন্ধে জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি
কিন্তু তাদের কিছু বলতেই আমার বিবেক নুয়ে পড়ছে
অপরাধবোধের তাড়নায়
কিছুক্ষণ পর কর্ণফুলীকে সাক্ষী রেখে
হাজার হাজার বর্ণমালা গর্জে উঠল, প্রকম্পিত হলো চারিদিক
বলে উঠল আমরা কি ফিরে যাব?
আগামী বছর আবার কি ফিরে আসব?
ভগবান বৈদ্য আর সূর্য সেনদের ঝোলায়
আর কয় দিন আমাদের রাখবে।

শহীদ মিনারের পাশের পুরোনো আদালত ভবন কেঁপে উঠল
আশপাশের লোকজন নড়েচড়ে উঠল
কর্ণফুলী ফুলে উঠল।
আমাদের কোনো উত্তর জানা নেই
আমরা তাদের কিছু বললেও কি
তারা আমাদের অমসৃণ ভঙ্গুর হাতের
ছোঁয়া কি নেবে?

শহীদ মিনারকে পেছনে ফেলে এসে
কারও চোখ ভিজেছে কি না
কেউ চোখের জল মুছল কি না জানি না
কিছুক্ষণ পর আমরা ধীরে ধীরে
তেল ডিজেলের পোড়া গন্ধময় ব্যস্ত শহরে মিশে গেলাম।

তঞ্চঙ্গ্যা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখযোগ্য। এদের বসবাস মূলত রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায়। ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা—এসব দিক থেকে চাকমা ও মারমাদের মতোই তঞ্চঙ্গ্যারা অনেক দূর এগিয়েছে। জাতিগতভাবে তঞ্চঙ্গ্যারা নিজেদের স্বতন্ত্র বলে দাবি করে। তবে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিচারে অনেকের মতে, তারা চাকমা জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি গোত্র। ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমা জাতির একটি উপগোত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ দেশে ২১ হাজার ৫৭ জন তঞ্চঙ্গ্যা বাস করে। ২০০১ সালের শুমারি থেকে জানা যাচ্ছে, এ সংখ্যা বেড়ে ৩১ হাজার ১৬৪ হয়েছে।

তঞ্চঙ্গ্যা জাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। চাকমা ভাষার মতোই এই ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এর মূল উৎস 'মন' ভাষা। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার মধ্যে উচ্চারণগত তারতম্যই মূল পার্থক্য। এই দুই ভাষার বর্ণমালার মধ্যেও দারুণ মিল। তবে তঞ্চঙ্গ্যা লিপির সঙ্গে চাকমার চেয়ে বর্মি লিপির সাদৃশ্য বেশি। নৃ-গবেষক আবদুস সাত্তার জানিয়েছেন, 'ভাষাগত বিচারে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার সাদৃশ্য থাকলেও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কারণে তঞ্চঙ্গ্যাদের ব্যবহারিক শব্দাবলিতে আরাকানি বা মারমা শব্দের প্রচলন ও প্রভাব লক্ষ করা যায়।' বর্তমান তঞ্চঙ্গ্যাদের দাইনাক বর্ণমালাকে 'ছালাম্যা' বলা হয়, যার অর্থ 'গোলাকার'।

বহু তঞ্চঙ্গ্যা এখন মাতৃভাষায় লেখালেখি করছেন। এসব কবিতার মধ্যে আছে দেশাত্মবোধ ও জাতিগত সম্প্রীতিবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। যোগেশচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার একটি কবিতায় আছে:

বাংলাদেশ বাংলাদেশ
আমা সোনা বাংলাদেশ

তুই আমা মা দুক্যা
ত দুক্যা নাই কন দেশ ॥
আমা দেশত বনে বনে
ফরন নানান ফুল
কালা ভঙার গীর গনে
মনান অয় আকুল
ও মা ত বুগত আমি সুগে আগি
সর্গত্তুন বেগ ॥ ঐ
'আমা দেশত মাইনচ্য মনত
কোনো ইংসা নাই
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
ব্যাক্কুনে ভাই ভাই
ও মা ত বুগত আমি সুগে আগি
সর্গত্তুন বেগে ॥ ঐ

রবিন তঞ্চঙ্গ্যা এই লাইনগুলোর বাংলা করেছেন :

বাংলাদেশ বাংলাদেশ
আমার সোনার বাংলাদেশ
তুই আমার মায়ের মতো
তোর মতো নাই আর কোনো দেশ ॥ ঐ
আমার দেশে বনে বনে
ফোটে নানা ফুল
কালো ভ্রমরের গীত গানে
মন হয় আকুল
মা তোর বুকে
মোরা সুখে আছি
স্বর্গের চেয়ে বেশ ॥ ঐ
আমার দেশে কারো মনে
কোনো হিংসা নাই
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
মোরা ভাই ভাই
মা তোর বুকে
মোরা সুখে আছি
স্বর্গের চেয়ে বেশি ॥ ঐ

পালি

পালি প্রাচীন ভারতের একটি সমৃদ্ধ ভাষা। 'পালি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'সেক্রেড টেক্সট' অর্থে। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা মনে করেন, পালি ভাষা শাশ্বত, এ ভাষার পরিবর্তন অসম্ভব। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং এ ভাষায় কথা বলতেন, উপদেশ দিতেন। পালি ভাষা বৈদিক ভাষার মতো 'দেবভাষা' হিসেবেও অভিহিত।

পালি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। এ ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। বিভিন্ন দেশে পালি ভাষা লিখিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে। শ্রীলঙ্কাতে পালি লেখা হয়েছে সিংহল লিপিতে। এ ছাড়া খ্মের, থাই, দেবনাগরী, বর্মি ও লাও লিপিতেও পালি লেখার প্রচলন আছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত পালি ভাষা ও সাহিত্যের অসামান্য বিকাশ ঘটে। গৌতম বুদ্ধ এ ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে তাঁর অনুসারীদের কাছে পালি ব্যাপক তাৎপর্য লাভ করে। তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য পুরো উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই শ্রাবস্তী, জেতবন, বেণুবন, পূর্বারাম, নালন্দা, চাপাল চৈত্য প্রভৃতি বিহার ও সঙ্ঘারাম গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্মালোচনার মাধ্যম হিসেবে ক্রমে পালি ভাষাকে আশ্রয় করেন। পরে এই ভাষাতেই বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সংকলিত হয়।

বাংলাদেশে পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় মূলত ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে। ব্রিটিশ আমলে ত্রিপিটকসহ বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। বাংলাদেশে ত্রিপিটকচর্চার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। প্রথম দিকে দেবনাগরী ও রোমান হরফে পালি গ্রন্থ ছাপা হতো, পরে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় পালিচর্চার পথ সুগম হয়। এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। পালিচর্চার প্রসারে নানা পত্রপত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্রিকা হচ্ছে: *বৌদ্ধ পত্রিকা* (১৯০৬, চট্টগ্রাম), *বৌদ্ধবন্ধু* (১৯১১, চট্টগ্রাম), *মৈত্রীবাণী* (ঢাকা)।

১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পালি পড়ানো শুরু হয়। এরপর প্রথমে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান স্কুলগুলোতে এবং পরে কলেজ পর্যায়ে পালি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানে পালি ভাষার চর্চা শুরু হয়। ১৯৭০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সংস্কৃত ও পালি বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। বিশেষভাবে পালি ভাষা চর্চার জন্য ২০০৭ সালে পালি অ্যান্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগ চালু করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পালি ভাষায় রচিত *ধম্মপদ*-এর বাংলা রূপান্তর করেছেন। 'যমকবগ্গো' বা 'যুগ্মগাথা'র লাইনগুলো ছিল :

মনোপুব্বঙগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং ॥১

মনোপুব্বঙগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী ॥২

'অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি ॥'৩

'অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং নূপনয্হন্তি বেরং তেসূ প সম্মতি ॥'৪

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥৫

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে।
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা ॥৬

রবীন্দ্রনাথের তর্জমায় দাঁড়িয়েছে :

যুগ্মগাথা

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজে করে কিম্বা কথা ভণে

দুঃখ তার পিছে ফিরে   চক্র যথা গোরুর পিছনে ॥১
মন আগে ধর্ম পিছে,   ধর্মের জনম হল মনে—
যে জন প্রসন্ন মনে   কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
সুখ তার পাছে ফিরে   ছায়া যথা কায়ার পিছনে ॥২

'আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবল বাড়িল ॥'৩

'আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল ॥'৪

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয় ॥৫

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে ॥৬

ফারসি

ফারসি ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ পুরোনো। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল। ইরান থেকে আসা সুফি-দরবেশ, ব্যবসায়ী, সৈনিক ও রাজন্যরা এখানে ফারসি নিয়ে আসেন। বাংলায় ইসলাম প্রসারের পেছনে এঁদের উদ্যম বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ইসলামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই জনপদে আসে আরবি ও ফারসি। ১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া-বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম যুগের সূচনা হয়। এর পর থেকে যেখানেই মুসলমানদের বসতি হয়েছে, সেখানেই মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা।

৬০০ বছরের (১২০৩-১৮৩৭) বেশি সময় ধরে ফারসি ছিল বাংলার রাষ্ট্রভাষা। এই দীর্ঘ সময়ে হাজার হাজার ফারসি গ্রন্থ লেখা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি বা ছাপা বই হিসেবে এসব পৃথিবীর নানা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। মধ্যযুগে প্রধানত ফারসি ও বাংলা ভাষার সমন্বয়ে মুসলমান লেখকদের মধ্যে 'দোভাষী সাহিত্য' বলে একটি বিশেষ সাহিত্যরীতির প্রসার ঘটে। একে অবশ্য দোভাষী না বলে 'মিশ্র সাহিত্য' বলাই সংগত।

উনিশ শতকে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ও আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় ফারসি ভাষার চর্চা প্রসার লাভ করে। মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু রাজা-মহারাজারাও ফারসি সাহিত্যচর্চায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। বাংলার রেনেসাঁর প্রধান পুরুষ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ফারসি ভাষায় *তোহফাতুল মুওয়াহিদীন* গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৩৭ সালের ২০ নভেম্বর কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট একটি অধ্যাদেশ (নং ২৯, ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) জারির মাধ্যমে অফিস-আদালত তথা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ফারসির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। এরপর ফারসি ভাষার চর্চা স্তিমিত হয়ে আসে।

বাংলাদেশে এখন মূলত বিদ্যায়তনিক পরিসরেই ফারসির চর্চা হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে যে ১২টি বিভাগ খোলা হয়েছিল তার একটি 'ফারসি ও উর্দু বিভাগ'। ২০০৬ সালে 'ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' নামে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু হয়। এর বাইরে ফারসির চর্চা অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু বাংলা ভাষার ওপর ফারসির ব্যাপক প্রভাব কমজোর হয়নি। ফারসিচর্চার ৭০০ বছরে বাংলা ভাষায় প্রচুর ফারসি শব্দ ও ভাষাভঙ্গি প্রবেশ করেছে। আমাদের সাহিত্যে নানা সময়ে অন্তত ১০ হাজার ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতিপরিচিত বাংলা শব্দ ও বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে ফারসির প্রভাব। যেমন, 'আবহাওয়া এখন বেশি গরম আছে'—এ বাংলা বাক্যটি শব্দ ও গঠন দুই দিক থেকেই 'আবহাওয়া আকনুন বিশ গার্‌ম আছত্'—এই ফারসি বাক্যের অনুরূপ।

ফারসি ভাষার বিখ্যাত মরমি কবি জালালউদ্দিন রুমী তাঁর *মসনবী*তে ফারসি সম্পর্কে লিখেছেন, 'যা বলার ফারসিতে বলো, আরবি যদিও বেহ্‌তর—প্রেম নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেবে সকল ভাষার ভেতর।'

বম

বাংলাদেশে বম নৃগোষ্ঠীর বসবাস মূলত চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায়। এ ছাড়া রাঙামাটির বিলাইছড়িতেও কিছু কিছু বম বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এদের লোকসংখ্যা ৬ হাজার ৯৭৮। বমরা একাধিক নামে পরিচিত, যেমন : বম, বন, বাউন, বনজোগি, বঙ। গবেষকদের ধারণা, এককালে চীনের মূল ভূখণ্ডের চিনলুং এলাকায় এই জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। পরে বার্মার চেনদুইন ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরা সরে আসে।

বমরা নিজেদের বলে থাকে 'লাই' বা 'লাইম'। এ শব্দের অর্থ 'মানুষ'। এদের প্রধান দুটি গোত্র : 'শুনথলা' ও 'পাংহয়'। কৃষিজীবী বমদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

বমরা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম বম ভাষা। এই ভাষাটি চীনা-তিব্বতি ভাষা-পরিবারের কুকি-চিন-নাগা শাখার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৯৪ সালে রেভারেন্ড জে এইচ লরেইন ও রেভারেন্ড এফ ডব্লিউ স্যাভেজ মিজোরামের আইজলে রোমান বর্ণমালা অনুসরণে একটি লিপির প্রবর্তন করেন। মিজোরাম থেকে আসা লুসাই ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এই লিপি বম-পাংখোয়াদের মধ্যে প্রচলিত হয়। বমদের নিজস্ব ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয়েছে।

এই বর্ণমালায় ২৫টি রোমান বর্ণ ব্যবহার করা হয়। রোমান হরফে বম বাক্য ও তার বাংলা দেখানো হলো। সঙ্গে দেওয়া হলো বম ভাষার বর্ণমালা :

LASUI TIAL (বম বর্ণমালা)

Bâwm hawlh lakah Lasui Tial 25 a um. Chu tla chu a ekte hen 'Lasui Tial' mawh 'Chatial' ti asi.

(বম ভাষায় মোট ২৫টি বর্ণ আছে। এগুলোকে একত্রে বর্ণমালা বলে।)

Bâwm hawlh lakah lasui Tial chi nih a um:- Åw pâk leh Åw-bawp.

(বম ভাষায় বর্ণ দুই প্রকার : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।)

ÂW-PÂK (স্বরবর্ণ)

'Âw-pâk' 6 a um—a, aw, e, i, o, u.

(স্বরবর্ণ ছয়টি : আ, অ, এ, ই, ঔ, ও)

ÂW-BAWP (ব্যঞ্জনবর্ণ)

Âw-bawp 19 a um—b, ch, d, f, g, ng, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, t, v, z.

(ব্যঞ্জনবর্ণ ১৯টি : বি, চ, ডি, এফি, জি, এন্‌জি, এইচ্‌ছি, জে, কে, এল্‌, এম্‌, এন্‌, পি, আর্‌, এসি, তি, টি, ভি, জেত।)

বম ভাষায় সাহিত্য রচিত হচ্ছে। বম ভাষার কবি ফুয়াহতু লেহ থ্‌লুক (Phuahtu leh Thluk) তাঁর 'বাংলাদেশ কান রাম' শীর্ষক কবিতাটি লিখেছেন বাংলাদেশ নিয়ে। জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম দরদ থেকে রচিত কবিতায় তিনি লিখেছেন :

Bangladesh Kan Ram

Aw ka suaknk Bangladesh ram nuam,
Ka nan chawisang ka suaknak ram;
Laikulh ram tla ah ram tenau sikhwawmle,
ram the leh ningno aw Sunar Bangla.

Bangladesh, Bangladesh kan ram,
Phunkip chikip lengnak Sunar Bangla;
Ram ningno leh tual mun tha,
Thlai chikip chingnak mum tha chem.

Ka suaknak leh ka thang liannak ram,
Duhhen thil chikip, din leh eiphung;
A kim e laikulh ram zawng tla ngak khawm ben,
Duh thusam a tling aw Sunar Bangla.

Hi ngak ram nuam hi kan tawng lai ma?
Tawng kho ding hen kei ka ruat lo;
Khualtlawng zivel nak a rem tlang leh tiva.
Tipi leh Tivate, Lawng leh ke hen.

লালচেওসাং বম ও লাল থানাজুয়াল যৌথভাবে কবিতাটির তর্জমা করেছেন :

আমার বাংলাদেশ
বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি
তোমায় নিয়ে গর্ব করি,
অনেক দেশের তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও
সোনার বাংলা আমার এই দেশ।

বাংলাদেশ ও আমার বাংলাদেশ
সকল জাতির এই সোনার বাংলা
সুজলা-শ্যামলা এই আমার মাটি
ফল-মূল জন্মানোর দেশ।

এই মাটিতে জন্ম ও বড় হয়েছি
হরেক রকম খাবার পেয়েছি
সকল দেশের রানি আমার দেশ
মনের মতো পেয়েছি আমার সোনার বাংলা।

এই দেশের চেয়ে সুন্দর দেশ কোথায় পাব বলো?
ভাবতে পারি না এই দেশের মতো আর দ্বিতীয় একটি পাব
ভ্রমণের জন্য নদী ও সবুজ পাহাড়
পায়ে ও নৌকায় যাওয়া যায় ছোট ও বড় নদী।

বাংলা

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ যেসব ভাষায় কথা বলে তার মধ্যে বাংলার অবস্থান ষষ্ঠ। বাংলাদেশে বাংলা কার্যত অদ্বিতীয় ভাষা। ভারতের ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা। বাংলা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*। পণ্ডিতদের মতে, *চর্যাপদ* কম-বেশি এক হাজার বছরের পুরোনো। *চর্যাপদ*-এর পরে বাংলা ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নিদর্শন রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ*।

বাংলা স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

বাংলা বর্ণমালা

ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তিত কুটিল লিপির পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অসামান্য বিকাশ ঘটে। এ সময় বাংলা

সাহিত্য মূলত তিনটি ধারায় চর্চিত হয়েছে—বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গল সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য। এই পর্বের গোড়ার দিককার উল্লেখযোগ্য রচনা: বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, কবি কঙ্কনের *বিদ্যাসুন্দর*। এ যুগেই *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *ভাগবত*-এর অনুবাদকে ঘিরে বিপুল সাহিত্য রচিত হয়। এই কালপর্বের সাহিত্যিক বিকাশে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব। চৈতন্য তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বাংলায় প্রচার করায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব জোয়ারের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যকে ঘিরে এ সময় রচিত কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ: বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* (১৫৭৩), জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* (ষোড়শ শতকের শেষভাগ) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্য চরিতামৃত* (১৬১৫)। এই পর্বের আরেকটি সাহিত্যধারা হচ্ছে পদাবলি। পদাবলি রচনার বিষয় রাধাকৃষ্ণের লীলা। এই ধারায় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে আছেন: চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস ও গোবিন্দদাস।

বাংলা ভাষার মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম শাহ মুহম্মদ সগীর। *ইউসুফ-জুলেখা* রচনা করে খ্যাতিমান হন তিনি। এ ছাড়া শেখ ফয়জুল্লাহর *গোরক্ষবিজয়*, সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশের* কথাও বলা যায়। মঙ্গলকাব্যের যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি দুজন: কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। এই পর্বে পূর্ববঙ্গে বিকশিত হয়েছে লোকগাথার একটি ধারা। এগুলো *পূর্ববঙ্গ-গীতিকা* নামে প্রচারিত।

বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের শুরু হয় পাদরি ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে। বাংলা গদ্যের শুরুর পর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। এরপর রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের নানা মাধ্যমে কাজ করে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষার মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় একার প্রতিভায় এই ভাষাকে শিখরে পৌঁছে দেন।

বাংলা ভাষার প্রতি এই ভাষাভাষী মানুষ নানাভাবে অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) 'বঙ্গবাণী' কবিতায় লিখেছেন, 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।/ সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকজন তরুণ প্রাণ দেন। ১৯৫৬ সালে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ২০০০ সালে ইউনেসকো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত : বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ (১৩১২ বাংলা সালে) 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই কবিতাটির প্রথম ১০টি চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের প্রথম চার চরণ বাজানো হয়। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *স্বরবিতান* ৪৬-এর *গীতবিতান*-এর 'স্বদেশ' শীর্ষক প্রথমগীতি।

সংগীতটি বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্বদেশি আন্দোলনের সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে গানটির পুনরুজ্জীবন ঘটে। গানটি ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকায় এক বিশাল জনসভায় এবং পরে ৩ মার্চ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ আয়োজিত জনসভায় পুনরায় গীত হয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের প্রাক্কালে গানটি গাওয়া হয়েছিল। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পরিবেশিত হয়।

স্বাধীনতার পর সাংবিধানিকভাবে (অনুচ্ছেদ ৪.১) 'আমার সোনার বাংলা' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে ঘোষিত হয়। গানের প্রথম ১০ লাইন কণ্ঠসংগীত এবং প্রথম চার লাইন যন্ত্রসংগীত হিসেবে পরিবেশনের বিধান রাখা হয়েছে। নিচে *গীতবিতান*-এর 'স্বদেশ'-এ অন্তর্ভুক্ত সম্পূর্ণ কবিতটি দেওয়া হলো :

আমার সোনার বাংলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি ॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি ॥
ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥

বাংলাদেশের রণসংগীত : বাংলাদেশের রণসংগীত 'চল্ চল্ চল্'-এর রচয়িতা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ওই রণসংগীত প্রথম প্রকাশিত হয় 'নতুনের গান' শিরোনামে বাংলা ১৩৩৫ সালে *শিখা* পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায়। এটি এখন *সন্ধ্যা* কাব্যের অন্তর্গত। উৎসব-অনুষ্ঠানে রণসংগীতটি ২১ চরণ বাজানো হয়। সম্পূর্ণ গানটি নিচে দেওয়া হলো :

চল্ চল্ চল্
কাজী নজরুল ইসলাম

কোরাস
চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,

অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নও জওয়ান
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ভাঙরে ভাঙ পাগল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস
ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদি-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ—
খোল রে নিদ্-মহল।

কবে সে খোয়ালি বাদশাহি
সেই সে অতীত আজো চাহি
যাস মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস অশ্রুজল।

যাক রে তখত-তাউস
জাগ রে জাগ বেহুঁশ।
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য

কত রোম গ্রীক রুশ,
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ হীনবল।
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধুলায় তাজমহল!
চল্ চল্ চল্ ॥

ভাষাবিষয়ক বাংলা প্রবাদ-প্রবচন

১. শব্দই ঈশ্বর।
২. মনে ভাব দানা বাঁধলে মুখে শব্দ আসে।
৩. শব্দের সীমানা তার অর্থকে ছাড়িয়ে।
৪. দেশগুণে বেশ, ভাষার নাই শেষ
৫. এক দেশের বুলি, আর এক দেশের গালি।
৬. অ-আ-ক-খ পেটে নাই অক্ষর
পুঁথি লইয়া ঘরঘর।
৭. কালি কলম মন, লেখে তিনজন।
৮. কালি কলম কষি, তিন নিয়ে দপ্তরে বসি।
৯. কায়েতে কলম চিনে। হরফ চিনে মহুরি
জহর চিনে জহুরি।
১০. ফারসি পড়ে যে জামাই, তার থেকে ভালো নাই।
১১. অনুস্বর দিলে যদি সংস্কৃত হয়
তবে কেন রামসুন্দর মাচার তলে রয়।
১২. বাঙালি কুত্তার মারহাট্টা বোল
বা ইশকারি রাও।
১৩. বাঙালি পুত আরবি কয়
'আব আব' কইরা মরণ অয়।
১৪. কোন দেশে গেলি বেটা 'ওয়াটার' শিখে এলি
'ওয়াটার, ওয়াটার' করে বেটা পানির লেগে মরলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি

বাংলাদেশে মূলত সিলেট বিভাগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার প্রচলন আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার দুটি উপভাষা। একটি 'রাজার গাঙ', অর্থাৎ 'রাজার গ্রাম'; আরেকটি 'মাদাই গাঙ', অর্থাৎ 'রানির গ্রাম'। কে পি সিনহার মতে, নব্য ইন্দো-আর্য ভাষার উৎপত্তির কালে, কিংবা তার ঠিক পরেই—অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে—ইন্দো-আর্য ভাষা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার উদ্ভব। শুরুতে এই ভাষা ভারতের মণিপুর রাজ্যে প্রচলিত হয়। এই নতুন ভাষা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গতা পায় ষোলো শতকে।

তেরো থেকে ষোলো শতক পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ও মেইতেই জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় মেইতেই মণিপুরি ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। উনিশ শতকের শুরুতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় ব্যাপকভাবে ইন্দো-আর্য ভাষা-পরিবারের শব্দাবলি প্রবেশ করে। অহমিয়া ও বাংলার সঙ্গে এই ভাষার সাদৃশ্য থাকায় একে বাংলা বা অহমিয়ার উপভাষাও বলা হয়ে থাকে। তবে পণ্ডিতদের অনেকেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরিকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর *লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে* (১৯০৩) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা সম্পর্কে লিখেছেন, '[বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি] ভাষার মধ্যে দুই ভাষার (অহমিয়া ও বাংলা) বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেও উভয়ের সঙ্গেই এর বড় ধরনের পার্থক্য আছে।' ড. কালিপ্রসাদ সিংহের মতে, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় এযাবৎ সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার শব্দ। এর মধ্যে তৎসম শব্দ ১০ হাজার, অর্ধ তৎসম ১ হাজার ৫০০, তদ্ভব (অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি) ৮ হাজার, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ২ হাজার, দেশি শব্দ ১ হাজার, ধনাত্মক শব্দ ৫০০, বহিরাগত (মৈ তৈ ৩ হাজার ৫০০, আরবি-পার্সি-তুর্কি ২ হাজার, পর্তুগিজ-ইংরেজি ৭০০) ৬ হাজার ২০০ ও মিশ্র শব্দ ১ হাজার। এ ছাড়া সন্দিগ্ধ অর্থাৎ উৎস সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে এমন শব্দ রয়েছে ১ হাজার ৩০০।

ভারতের আসাম ও ত্রিপুরার পাশাপাশি মিয়ানমারেও এই ভাষাভাষী মানুষ আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষার অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্রে 'মণিপুরি অনুষ্ঠান' নামে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মেইতেই মণিপুরি ভাষায় গান, কথিকা ও নাটিকা প্রচারিত হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার স্বীকৃতির জন্য এই ভাষাভাষী মানুষেরা সংগ্রাম করেছেন ভারতে। আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চ রেল অবরোধ কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। তাতে সুদেষ্ণা সিংহ প্রাণ দেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাহিত্যভান্ডার সমৃদ্ধ। এ ভাষার কবি রনজিত সিংহের একটি কবিতা :

মণিপুরী ইমার ঠার

মা তি হিকাছৎ নুংশিপা ঠারে
আমি হাদ্দিন ততারারাঙ,
তি হিকাছৎ কঙানা রৌয়ে
হেক্করিয়া এলা দেরাঙ।

এ ঠারে বিলাছৎ আবকসা বাহানা
হীন লেইরা কুঙগৌ থা নেই না পানা
এ ঠারনো মারুপ বিসারিয়া পেইলাঙ লেঙ্কাকতি,
নুয়ারাপানি ইলে রাতিনঙৈত
তাপ উঠিয়া আস্তা গারিত
ঘুমর হাদিৎ বিবিয়ানি সায়া হারিলাঙ মতিগতি।

মাঠিয়া দিয়াছৎ আত সালকরিয়া
ইমার ঠারন খানি ফুদেদিয়া
মন্ত্রর গুণে হায়হান করে বালা ইলাঙ ত্বরা করে,
খেতিয়ালার হীন-দুখহানি
ধানর লপুকে বালা কাপানি
ইমার ঠারর এলা দিয়া দিয়া হোনার ধানগি আনি লক্করে।

রাসহান ইল মান্ডবে আজি
মণিপুরী ঠারে হৃদিগ বুঝি

নাচে গোপীনিয়ে বিরহিনী রাধার-জলগ আখিরপানি,
কীর্তন এলার মন্দিরে আজি
কার্তিক মাহার লেরিক ঠিকরানি
সেনধ্যা আরতিত দোহারর তালে রাগাগো তুলানি।

খরাহান ইয়া মাটিহান ফাটিল
ফৌদক নেয়া চিন্তা বাড়িল
পৌরেই এলানো মণিপুরী ইমা বরন ডাহানির সালে,
ঝর ঝর ঝর বরন পড়িল
লপুক-লৌরাঙ তেঙারা তিঙিল
গরগি হাবি-গেলোগা বুরিয়া গোলার পানিয়ে কাল-এ।

লেঙ্কা মারুপ লিশিং মারুপ
হুরু হুরু সৌ আটতারা সুপ
ঘুমযাওয়ানির এলা হুনুইয়া আহিগো জিপিয়া যানা,
হেইমাকেরৌ নুঙে জীবন
বানাপানি দিয়া বেয়ক বনকর মন
ইমার ঠারর উম পেয়া পেয়া জনম পালোয়া থানা।

কবির বাংলায় অনুবাদ :

মণিপুরি মায়ের ভাষা

মা তোমার শেখানো মধুর ভাষায়
মোরা প্রতিদিন কথা বলি,
তোমার শেখানো কোমল সুরে
স্বরে স্বরে গাই গানগুলি।

বিলিয়েছ তুমি অশেষ স্নেহ
দুখী হীন জনে বঞ্চিত নাহি কেহ
আপন ভাষায় বন্ধু খুঁজে খুঁজে সুহৃদ পেয়েছি কত,
অসুখ হলে রাত দুপুরে
জ্বর তামাশায় সারা শরীরে
ঘুমের ঘোরে বকেছি প্রলাপ 'ঢেউ-পাগলের' মতো।

দিয়েছ বুলিয়ে হাতখানি খুলে
আপন ভাষায় ফু-ফা ধ্বনি তুলে
মন্ত্রের গুণে বুঝি মা গো তাই সেরে উঠেছি ত্বরা,
কৃষাণীর যত দুঃখ গ্লানি
ধানখেতে খেতে 'বালা কাপানি'
গান গেয়ে গেয়ে সোনালি ফসল কাটা হল সারা।

রাসলীলা হলো আজি মন্দিরে
মণিপুরি গানে মন প্রাণ জুড়ে
নৃত্যরতা গোপীগণে দোলে বিরহিনী রাধা কাঁদে আঁখিজলে,
কীর্তন গানে মজিছে লোক
কার্তিক মাসে পুঁথিপাঠে হোক
সন্ধ্যা-আরতির অপরূপ রাগ দোহারের তালে তালে।

খরায় ধরা চৌচির প্রায়
ফসলহীনের চিন্তা যে ধায়
লোকগীতি গানা মণিপুরি মায় বৃষ্টি-আবাহনী বেশে,
ঝর ঝর ঝর বারিধারা ঝরে
মাঠ-ঘাট-বন-বাদাড়ে-পাহাড়ে
ঘরগুলো সব নিল যে ছাড়ায়ে সারা গাঙ বানে ভেসে।

সবুজ সাথি হাজারো সাথি
ছোট ছোট শিশু পা পা হাঁটি হাঁটি
ঘুমপাড়ানির গান গাওয়া শুনি নিদ্রামগ্ন হলে,
দম্পতিগণের সুখের জীবন
মায়া-মমতায় বাঁধা ভাইবোন
মায়ের ভাষায় উষ্ণতা মেখে জীবন যেমন যায় চলে।

মারমা

বাংলাদেশে মারমা নৃগোষ্ঠীর বসবাস মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে। এই অঞ্চলে যেসব নৃগোষ্ঠীর বসতি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে মারমারা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার মধ্যে বান্দরবানে সবচেয়ে বেশি মারমার বসবাস। এ জেলার প্রায় সর্বত্র মারমা বসতি রয়েছে। কিছুসংখ্যক মারমা উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীতে বাস করে। এসব মারমা নিজেদের রাখাইন বলে পরিচয় দেয়। প্রায়শই তাদের আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বঙ্গু, খোয়ে, শিলো, থৌলে ও সাব্রুম এলাকায়; মিজোরামের রাইনক্ষ্যং ও সাংলাকক্ষ্যং এলাকায়; মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের লেমাই গোয়ং, পুলুতং ও নাজিরোওয়ায় এবং রেঙ্গুন শহরে মারমা জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

মারমা ভাষা মারমাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা। বাংলাদেশে ১ লাখ ৫৪ হাজার ২১৬ জন মানুষ মারমা ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষা তিব্বতি-বর্মি শাখার বর্মি দলভুক্ত। মারমা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। এই ভাষার লিপির নাম 'ম্রাইমাজা'। ১৩টি স্বরবর্ণ ও ৩৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে মারমা লিপি গঠিত। মারমা লিপির উৎস মোন্-খ্মের না ব্রাহ্মী লিপি তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মারমা-সমাজে সংগীত ও গীতিনাট্যে মারমা লিপির ব্যবহার সুপ্রাচীন। বর্মি ভাষার সঙ্গে এই ভাষার প্রচুর মিল রয়েছে। তবে উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি ও বাক্যগঠন রীতিতে দুই ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা ভাষার সঙ্গে রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে মারমা ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলায় বহুবচন লিখতে ব্যবহৃত হয় 'রা'। মারমা ভাষায় বহুবচন লেখা হয় 'রো' দিয়ে। মানুষের বহুবচন 'মানুষেরা' মারমা ভাষায় লেখা হয় 'লুরো'। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষার ব্যবহারিক শব্দের মধ্যে মারমা শব্দের প্রচলন ও প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মারমা বর্ণমালা

মারমারা নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনা করছে। মারমা কবি চ থুই ফ্রু তাঁর 'বাংলাদেশ গো খ্য পা মে' অর্থাৎ 'বাংলাদেশকে ভালবাসবো' কবিতায় বাংলাদেশের প্রতি গভীর দেশপ্রেম প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন :

অক্যেয়াইরো মুইরে প্রে বাংলাদেশ
অক্যেয়াইরো খ্যয় পারে দেম্রইংগো
দেপ্রেমো মুইংরো ইখ্যাইং রে
দেপ্রে হ্লারে কং গং সায়ারে ॥
মোরইক প্যাইং রে অগ্রো, অফ্রু, ওয়া, এমে
রোয়া আনাগা লাহ খারে
আসাইং পিরো খ্যং সে
দে প্রেমা মূইং রো ইখ্যাইং রে
দে প্রে হ্লারে কং গং সায়ারে ॥

মৈ তৈ মণিপুরি

মৈ তৈ মণিপুরি-ভাষীদের বসবাস মূলত বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে। ভাষা-পরিবারের দিক থেকে মৈ তৈ মণিপুরি তিব্বতি-বর্মি ভাষা-পরিবারের কুকি-চীন গোত্রভুক্ত। জর্জ গ্রিয়ারসন মৈ তৈ ভাষাকে ভোট-চীন পরিবারভুক্ত বলে উল্লেখ করেন। টি সি হাডসন তাঁর *দি মৈতৈস* বইয়ে মৈ তৈ ভাষাকে তিব্বতি-বর্মি ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মৈ তৈ অতি প্রাচীন ভাষা। এ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। অধিকাংশ গবেষকের মতে, মৈ তৈ লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। ভারতের মণিপুর রাজ্যে মহারাজ পাংখংবার আমলে এ লিপির প্রথম প্রচলন হয়। তখন মৈ তৈ ভাষার মোট হরফ ছিল ১৮টি। পরে মহারাজ খাগেম্বার (১৫৯৬-১৬৫১) সময়ে আরও নয়টি হরফ যুক্ত হয়। সপ্তম শতকের একটি ব্রোঞ্জ মুদ্রার ওপর মৈ তৈ লিপির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফলে মৈ তৈ লিপির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। মৈ তৈ লিপি প্রাচীন হলেও এ পর্যন্ত এই লিপিতে রচিত কোনো প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি।

পরে বাংলা লিপিতে মৈ তৈ ভাষা লেখার প্রচলন ঘটে। বাংলা হরফে মৈ তৈ ভাষায় রচিত গোড়ার দিককার দুটি গ্রন্থ হচ্ছে *পুইরেইতন খুনথক* ও *নুমিত কাপ্পা*। ত্রিপুরা রাজ্যে অবশ্য বাংলা ও মৈ তৈ দুই লিপিতেই মৈ তৈ লেখার প্রচলন আছে। মণিপুরি লিপির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এর প্রতিটি হরফের নাম রাখা হয়েছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম অনুসারে। বাংলা 'ক' বর্ণের মণিপুরি প্রতিবর্ণ 'কোক'। 'কোক' মানে 'মাথা'। 'স'-এর প্রতিবর্ণ 'সম'। এর অর্থ 'চুল'।

১৯৯২ সালে মৈ তৈ মণিপুরি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে 'মণিপুরি' নামে

মৈ তৈ বর্ণমালা

একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে মৈ তৈ ভাষায় নানা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা থেকে *ত্রিপুরা চে* নামে প্রকাশিত হয় মৈ তৈ ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা।

দীর্ঘদিন ধরেই মৈ তৈ ভাষায় সাহিত্যচর্চা হচ্ছে। মৈ তৈ ভাষার কবি খোইরোম কামিনী কুমারগী তাঁর 'লম্মন তোল্লবনি ঐদি বাংলা ইমাগী মফমদা' বা 'ঋণী আমি বাংলা মায়ের কাছে' কবিতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন :

ঐগী চেতনাগী সমদ্রুদা
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ
মতমপুম্বদা ঈচেল ওইনা চেল্লি।
রবীন্দ্রনাথ না ঐগী থাজবা—থম্মোয়গী ঙমখৈনি
নজরুল ঐগী নুংশিবা—লালহৌনি
জীবনানন্দনা ঐগী লৈপাকনিঙবা
দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদনা ঐগী খোম্ভোক্কী ঈশৈ;
লম্মন তোল্লবনি ঐদি
বাংলা অমসুং বাংলা ইমাগী মফমদা।
বাংলাগী ক্ষুদিরাম
ঐবু মৈ তৈ অঙম্বা টিকেন্দ্রজিৎকী বারী নিংশিংহল্লি।
বাংলাগী ভাষা আন্দোলন
ঐঙোন্দা নৌহৌননা চেতনা পিরকখি মৈ তৈ লোনবু নুংশিবগী।

কবিকৃত বাংলা অনুবাদে :

আমার চেতনার সমুদ্রে সদা প্রবহমান
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ।
রবীন্দ্রনাথ আমার প্রত্যয়—হৃদয়ের সীমানা
নজরুল আমার প্রেম-বিদ্রোহ
জীবনানন্দ আমার দেশপ্রেম,
দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ আমার কণ্ঠের গান।
ঋণী আমি বাংলা ও বাংলা মায়ের কাছে।
বাংলার ক্ষুদিরাম আমাকে
মৈ তৈ বীর টিকেন্দ্রজিতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়
বাংলার ভাষা আন্দোলন আমাকে
নতুন করে চেতনা দিয়েছে মৈ তৈ ভাষাকে ভালোবাসার।

মণিপুরি লিপিতে লেখা এ কে শেরামের (বাংলা বর্ণে) ভাষা নিয়ে একটি মণিপুরি কবিতা :

লোনগী অওয়াবা

ঐনা ওয়া ঙাঙঙি ঐগী ইরন্নায় লোনদা।
কনামত্তনা খঙবীদে লোন অদো

কনানসু তাবিদে ঐগী থম্মোয়নুংগী মীকপ-মীরাওখোল
কনানসু খঙদে ঐগী অওয়াবগী অরোনবা ওয়ারী-শিংবুন।
অদুনা মালেমসিগী মীয়ামলক্তা লৈদুনসু ঐদি ইথন্তনি ইথন্তা।

ঐদি মী ময়াম্মগী মরোল খঙন্তি।
মখোয়গী মায়-মীৎ, হকচাংগী কয়াৎ খুদিংনা
ঙাঙলিবা লোন
মদু পুন্নমক ঐদি নিংথিনা খঙন্তি;
খঙন্তি, মখোয়না করিনো পাম্মিবা ঐঙোন্দগী,
করম্বা পাউজেলনো মখোয়না শন্দোক্লিংলিবা
ঐগী থোপতা-থম্মোইদা, ওয়াখলগী কাচিন-কোয়া খুদিংদা
—লোয়না খঙন্তি ঐ।

ঐগী লোনতনি মখোয়না খঙবীদ্রিবা।
অওয়াবদি,
ঐগী মীচিক-মীরাওখোল তাদ্রবা পুন্সি অতিয়াসিদা
অহানবা ওইনা খোঞ্জেল ফাওহনবিখিবা নুজা,
খজিক্তং শোক্লকপদা মানা
ঐগী ওয়াখলগী সমুদ্রদা
মখোল থোক্তবগী অকনবা ঈরাউখোল'মনা তনিকহল্লিবা,
অদুগী নুজা'দুনাফাউবা ঐগী লোন খঙবীদ্রে হৌজিক।

অদুদি, ঐবু অসুম হায়না খরা খরা তৌদুনা
মাঙখিদৌরব'দুম লোন থোক্তবগী মপাল নাইদ্রবা ব্ল্যাকহোল'মদা।

কবিকৃত বাংলা অনুবাদ :

ভাষা

আমি কথা বলি আমার নিজস্ব ভাষায়।
কিন্তু সে ভাষা বোঝে না কেউ
কেউ শোনে না আমার হৃদয়ের অনন্ত ক্রন্দন
কেউ জানে না আমার বেদনার নিগূঢ় কাহিনি।
পৃথিবীর এই জনারণ্যে থেকেও তাই আমি বড়ো একা—একাকী।

আমি তো অনেকের ভাষা বুঝি।
তাদের চোখ-মুখ, শরীরের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
যে ভাষায় কথা বলে
আমি তার প্রায় সবটুকুই বুঝি;
বুঝি তারা কী চায় আমার কাছে,
কী বাণী তারা পৌঁছে দিতে চায় আমার বোধের আকাশে
আমার চেতনার অলিন্দে অলিন্দে কী বার্তা ছড়িয়ে দিতে চায়—সব বুঝি।

আমার ভাষা কেবল অবোধ্য থেকে যায় তাদের কাছে।
এমনকি যে নারী
আমার নৈঃশব্দ্যের ক্ষীরোদসাগরে প্রথম ধ্বনির জন্ম দিয়েছে
যার সামান্য স্পর্শ
আমার শিরায় শিরায়—প্রতি রক্তপ্রবাহে সৃষ্টি করে
শব্দহীনতার সুতীব্র শব্দের এক সর্বগ্রাসী সুনামি-গর্জন,
সেও বোঝে না আমার ভাষা।

তবে কি আমি এভাবেই
শেষাবধি হারিয়ে যাব ভাষাহীনতার এক কৃষ্ণবিবরে?

ম্রো

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের বান্দরবান জেলাতে মূলত ম্রো নৃগোষ্ঠীর বসবাস। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ম্রো জনসংখ্যা ২২ হাজার ১৭৮ জন। ম্রো ভাষা তিব্বতি-বর্মি ভাষা-পরিবারের কুকি-চীন গোত্রভুক্ত। জর্জ গ্রিয়ারসন তাঁর *লিংগুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া*তে ম্রো ভাষাকে বর্মি দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা-গবেষক সুগত চাকমা জানাচ্ছেন, 'ম্রোদের ক্রিয়াপদ ও বহুবচন গঠনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ভাষার সঙ্গে বর্মি ভাষার চেয়ে কুকি-চীন ভাষাগুলির অধিক মিল রয়েছে।'

ম্রো বর্ণমালা

বহুদিন ম্রো ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা ছিল না। ১৯৮৫-৮৬ সালে ম্রো ভাষাবিজ্ঞানী মেনলে ম্রো এই ভাষার বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। বান্দরবানের

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সন্তান মেনলে ম্রো দারিদ্র্যের কারণে উচ্চশিক্ষা পাননি। শৈশবে কাজের ফাঁকে বর্মি বর্ণমালা শিখেছেন। ছোটবেলা থেকেই মেনলে লক্ষ করেছেন, ম্রো জনগোষ্ঠীর ভাষা আছে, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, সাহিত্য-সংস্কৃতি আছে, অথচ নিজেদের বর্ণমালা নেই বলে সেসব সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। এই অভাববোধ থেকে তিনি ম্রো ভাষার একটি লিপি তৈরি করেন।

১৯৮৭ সালে মেনলের নিজের গ্রাম পোড়াপাড়ায় একটি ম্রো ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়। সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের নানা অঞ্চলের ছাত্ররা ম্রো ভাষা শিখতে আসেন। অনেকে মিয়ানমার থেকেও আসেন। এই বিদ্যালয়ের ফলে ম্রোদের ৬০ শতাংশ মানুষ নিজ ভাষার সাক্ষরতা লাভ করে। ম্রো ভাষার উন্নয়নে ম্রো-চেটের উদ্যোগে শিশুপাঠ্য বই প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে ম্রো ভাষা হুমকির মুখে। জনসংখ্যা ও ভাষাগত দিক থেকে ম্রো জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হওয়ায় এদের অনেকেই বহুভাষী। মাতৃভাষা ছাড়াও ম্রোদের মধ্যে বাংলা ও মারমা প্রচলিত আছে।

ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকসংগীত সুপ্রাচীন সুরের উত্তরাধিকার এবং অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। এসব গানে অরণ্যের প্রকৃতির রূপ ফুটে ওঠে। ম্রোদের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা, জীবন-জীবিকা ও যুদ্ধের বীরত্বগাথা তাদের লোকসংগীতের প্রধান উপজীব্য। ম্রো ভাষায় অনেকে লেখালেখিও করছেন। ম্রো কবি সিং ইয়ং মুরুংয়ের একটি দেশপ্রেমের কবিতা :

প্রেণমা কিয়োরী

কুপ্রেণ ত্বাং বাংলা মাং রং
সাদ লদ নিরুয়া লি-ইয়ং ওয়াং মাং।
প্রেন কম চাক ওয়া আপিয়ো অপা
নি কই ওয়ার কই প্রনমা নিঃইয়ুং।

তাই নাও সাক হন
প্রেন কম য়োওনা ওয়াই
তংসা কুয়ার হন
নিলং ত্রুয়া
পিয়োরী পিয়ো পা
ইয়া ত্য়োওয়া ওয়াই।

দম ক্লিক দম নাই
হুংমা রেদরীয়া।

নৃম নৃম ক্লাংইয়ুং
সাক অমরা ওয়াই।

মাং বং সেক সং
অররু অরফোয়া।
নিংওয়াং পুর প্রা
রু-ইয়ক ফোয়া ইয়ক
মেং স্রা লাইতুক।

এর বাংলা অনুবাদ :

দেশাত্মবোধ
আমার সোনার বাংলাদেশে [illegible]
সুবাতাস প্রবাহিত হয় প্রতিনিয়ত।
দেশবাসী উৎফুল্লচিত্তে
দিনাতিপাত করে নিজ নিজ কাজে।

ভালোবাসার বন্ধন রেখে
পাহাড়ি-বাঙালি
একসঙ্গে
বাস করে
একই দেশে।

দিগন্ত জুড়ে মাঠ
আর উঁচু-নিচু পাহাড়
অপরূপ সত্যি
আমার হৃদয়ের স্বদেশ।

মুনি-ঋষি, গুণী-জ্ঞানী
কত সাধক, নেতা
জন্ম নেবে ভবিষ্যতেও
শিল্পী-অভিনেতা।

রাখাইন

নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনাচার ও ধর্মকে লালন-পালনের দ্বারা সংরক্ষণ করার কারণে রাখাইন নামকরণ হয়েছে। রাখাইন ভাষার বর্ণমালার উৎস উত্তর ব্রাহ্মী লিপি। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে আরাকানে ব্রাহ্মী ও দেবনাগরী থেকে যে বর্ণমালা বিবর্তিত হয় তা-ই আজ রাখাইন বর্ণমাল্যা হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে রাখাইন লেখক, কবি ও গবেষকেরা নানা আঙ্গিকে লিখছেন।

একটা ফলকে রাখাইন বর্ণ

পটুয়াখালী, কক্সবাজার, বরগুনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ১৭ হাজার লোক রাখাইন ভাষায় কথা বলে। রাখাইন ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এটি মূলত মারমার একটি উপভাষা। রাখাইনদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। রাখাইন ভাষার বর্ণমালার উৎস উত্তর ব্রাহ্মী লিপি। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে আরাকানে ব্রাহ্মী ও দেবনাগরী লিপির বিবর্তনে যে নতুন লিপি গড়ে ওঠে, তাই আজ রাখাইন বর্ণমালা হিসেবে পরিচিত। রাখাইন বর্ণমালায় স্বরবর্ণ বা 'ছারা' ১২টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ বা 'ব্যেঃ' ৩৩টি।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে রাখাইনদের সংখ্যা ১৬ হাজার ৯৩২। মারমা, রাখাইন ও ম্যা-কে একই ভাষিক গোত্রের বিভিন্ন উপভাষাভাষী নৃগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মনিরুজ্জামান (১৯৯৪) রাখাইনদের দুটি প্রধান উপভাষা বা ভাষিক বৈচিত্র্যের কথা জানিয়েছেন। এগুলোর একটি হচ্ছে 'র‍্যামর‍্য' এবং অন্যটি 'মারৌও'। মুস্তাফা মজিদ রাখাইন ভাষার ভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন, 'এই ভাষা ইন্দো-আর্য বা দ্রাবিড়ীয় ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও দক্ষিণ ভারতের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।' রাখাইন বা মারমা ভাষায় লুসাই প্রভৃতি ভাষার মতো শব্দের শেষ ধ্বনিতে প্রায়শ আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় রুদ্ধ-হ ধ্বনির প্রকাশ ঘটে এবং একইভাবে দ্বৈতস্বর যুক্ত হলে তা দ্বি-ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনে রূপ পায়। এই ধ্বনি দুটিকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনধর্মী বলেছেন। বাংলা ভাষার শেষ স্বরধ্বনির মতো তা উচ্চারিত হয় না, বা উচ্চারণ মুক্তি পায় না।

রাখাইন ভাষায় দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য রচিত হচ্ছে। রাখাইন ভাষার কবি খিং রিয়ানের একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে আমি বাংলা করেছি। কবিতাটি বাংলায় এ রকম :

দৃষ্টি

এখানকার ও সেখানকার রাখাইন
সারা বিশ্বের সকল রাখাইন
তাদের ভাষার ফারাক থাকলেও
আমরা সব এক পিতার সন্তান।

আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিই
রাখাইন শব্দটি লেখা আছে অনন্য এক বইয়ে
আমাদের জাতিকে রক্ষা করি অনুভব, চেতনা ও আত্মায়।
আমাদের উৎপত্তি একই দিনে।
আমরা আজ যেখানেই থাকি
আমরা সবাই একই
'থাজুন' ফুলের সুরভির মতো।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী
পৃথিবীর সভ্যতার সূচনায়।

পিতা রাহিনের রক্ত থেকে উদ্ভূত
চিরদিন আমরা রাখাইন হিসেবেই বেঁচে থাকব।

সংস্কৃত

সংস্কৃত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই ভাষার চর্চা হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন *ঋগ্বেদ*। সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় উপশাখার একটি ভাষা। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। যে যে অঞ্চলে এর চর্চা হয়েছে সেখানে প্রচলিত বর্ণমালাতেই এটি লিখিত হয়েছে। তবে দেবনাগরী বা নাগরী বর্ণমালা সংস্কৃত লেখার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

अ आ इ ई उ ऊ
ए ऐ ओ औ
ऋ ॠ ऌ अं अः
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह

দেবনাগরী বর্ণমালা

সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য মহৎ গ্রন্থ রচিত হওয়ায় কালক্রমে এ ভাষা ভারতীয় চিন্তার আধার হয়ে উঠেছে। *ঋগ্বেদ*, অথর্ববেদ, উপনিষদের মতো প্রাচীনতম

শাস্ত্র; গভীর দার্শনিক তাৎপর্যে ভরা মহাভারত ও রামায়ণের মতো মহাকাব্য; ১৮টি বৃহৎ পুরাণ; *কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, বুদ্ধচরিত, নৈষধচরিত*-এর মতো কালজয়ী সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি নানা উপচারে সংস্কৃত ভাষার এক বিরাট সৌধ গড়ে উঠেছে।

বাংলা অঞ্চলে কবে সংস্কৃতের চর্চা শুরু হয় সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। তবে এর ইতিহাস অনেক প্রাচীন। আনুমানিক চতুর্থ শতকে গুপ্তযুগে রচিত একটি লেখমালায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পালযুগে (৭৫০-১১৬১) বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চর্চা হয়। সেনযুগের (১০৯৭-১২৬০) হিন্দু রাজারা এই চর্চাকে আরও বেগবান করে তোলেন। অনেকের মতে, সেনযুগ ছিল বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চার স্বর্ণযুগ। বল্লাল সেন (১১৫৯-১১৮৫) ও লক্ষ্মণ সেন (১১৮৫-১২০৬) ছিলেন বিদ্বান ও সাহিত্যানুরাগী।

মুসলিম যুগেও (১২০৬-১৭৫৭) বাংলা অঞ্চলে সংস্কৃতের উল্লেখযোগ্য চর্চা হয়। বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি নবদ্বীপ এ সময় সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের নাম প্রাচীনকাল থেকে সুপরিচিত। বাংলায় সনাতন পদ্ধতিতে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্রগুলো টোল নামে পরিচিত।

ধর্মীয় পরিসরের বাইরে বাংলাদেশে এখন মূলত একাডেমিতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনেক স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের চর্চা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান, স্নাতকোত্তর ও এমফিল-পিএইচডি পর্যায়ে সংস্কৃতের চর্চা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতেও সনাতন পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা সম্পর্কে *ঋগ্‌বেদ*-এ বলা হয়েছে, 'মাতৃভূমি, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষাকে সবারই শ্রদ্ধা করা উচিত; কারণ এগুলো মানুষকে প্রশান্তি দেয়। যে তার দেশ, সভ্যতা ও ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে মহত্ত্ব এবং জীবনের সমস্ত সুখ লাভ করে। তার ক্রিয়াকর্মাদি এমন হওয়া উচিত যাতে তার মাতৃভূমি, সংস্কৃতি ও ভাষার গৌরব হয়।'

অথর্ববেদে বলা হয়েছে, 'মাতৃভাষা থেকে আমরা যেন মুখ ফিরিয়ে না নিই। আমরা যেন মাতৃভাষার প্রতি সব সময় প্রসন্ন থাকি। ঈশ্বরকে যারা পরিতৃপ্ত করতে চায়, তারা মাতৃভাষায় স্তবগান করে। মাতৃভাষা আমাদের অশুচি দূর করে। মাতৃভাষার প্রতিটি শব্দ আমাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধনে সম্পৃক্ত। মাতৃভাষার প্রতিটি শব্দ থেকে বিশুদ্ধ ননির ক্ষরণ হয়। সব পবিত্র শিল্প অভিব্যক্তি পায় মাতৃভাষায়। আমরা যেন মাতৃভাষায় দেবতাদের গুণকীর্তন করি।'

সাঁওতালি

সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল মিলিয়ে পৃথিবীতে ৫০ লাখ মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের রাজশাহী, নওগাঁ, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ২ লাখের বেশি সাঁওতাল রয়েছে। সাঁওতালি ভাষার উপভাষা দুটি—নাহিলি ও করকু।

[illegible]

সাঁওতালি বর্ণমালা

সাঁওতালি ভাষার ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও দীর্ঘদিন এই ভাষার কোনো বর্ণমালা ছিল না। এর প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে, রোমান হরফে। ১৮৬৯ সালে ভারতের সাঁওতাল পরগনার লুথারিয়ান মিশনে স্থাপিত একটি ছাপাখানা থেকে সাঁওতাল ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে রঘুনাথ মুর্মু 'অলচিকি' বা 'ওলচিকি' নামে সাঁওতালি লিপি উদ্ভাবন করেন। তাঁর সে লিপি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতে এখন সাঁওতালি ভাষা দেবনাগরী লিপিতে লেখা হচ্ছে এবং তাতে বহু হিন্দি উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাংলাদেশে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে রাজশাহী জেলার বর্ষাপাড়া গ্রামে

বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সাঁওতালিদের মধ্যে কবি সাদু রামচাঁদ মুরমুই, বর্ধমানের মনোহর হাঁসদা, ঝাড়খণ্ডের বাবুধন মুরমু, উত্তর দিনাজপুরের রাস্তা হেমব্রম, বাঁকুড়ার ড. রঘুনাথ হেমব্রম, উড়িষ্যার পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু ছাড়া আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদ সাঁওতালি ভাষার জন্য লিপি তৈরি করার চেষ্টা করেন।

বাংলা ও সাঁওতালি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা-পরিবারভুক্ত হলেও এই দুই ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সাঁওতালি ভাষা অলচিকি, বাংলা না রোমান লিপিতে লেখা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে অনেকে বাংলা লিপিতে সাঁওতালি লেখার পক্ষে। অনেকে আবার মনে করেন, বাংলায় সাঁওতালি ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রোমান হরফে দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালি চর্চা হচ্ছে বলে রোমান লিপিই সংগত। প্রয়াত কবি শামসুর রাহমানের উপস্থিতিতে একবার এক সাঁওতালি ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'বাংলা লিপিতে যখন সাঁওতালি ভাষা লেখা হয়, তখন আমাদের ভাষার মাধুর্য হারিয়ে যায়।'

সাঁওতালি ভাষায় মননশীল-সৃজনশীল দুই ধারাতেই বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এ রকম বইয়ের মধ্যে আছে: *হাড়মাওয়াক আতো* (উপন্যাস), *মারে হাপড়ামকোয়াক কাথা* (সমাজবিজ্ঞান), *কাথা পাড়িয়ান* (সাঁওতালি অভিধান)। সাঁওতাল ভাষার কবি সারদাপ্রসাদ কিসকু তাঁর একটি কবিতায় নিজেদের লড়াকু চরিত্রের কথা তুলে ধরেছেন:

হুল সেরেঞ
নেরা নিয়া নুরুনিয়া
ডিঁডা নিয়া ভিটা নিয়া
হায়রে হায়রে। মাপাংক্ গপচ্ দো।
নুরিচ নাঁড়াড় গাই-কাড়া, নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগিৎ
সেদায় লেকা বেতা বেতেৎ এ্রাম রুওয়ীড় লাগিৎ
তবে দো বোন হুল গেয়া হো...ও

নুসীসাবোনে, নওয়ারাবোন চেলে হঁ বাকো তেঙ্গোন
খাঁটি গে বোন হুল গেয়া হো,
খাঁটি গে বোন হুল গেয়া হো
দিশম দিশম দেশ মীঞ্জহি পারগানা

নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো
দঃক বোন দানাংবোন বাংগো কো তেঙ্গোন,
তবে দো বোন হুল গেয়া হো।

কবির বাংলা অনুবাদ :

সাঁওতাল বিদ্রোহ
স্ত্রী-পুত্রের জন্য
জমি জায়গা বাস্তুভিটার জন্য
হায় হায় এ মারামারি এ কাটাকাটি।
গো-মহিষ, লাঙল, ধন সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মতো আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।

আমরা নিজেরাই বাঁচব,
কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
দেশের মাঝি ও পরগনার
গ্রামের মোড়লরা,
আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে,
কেউ পাশে দাঁড়াবে না,
তবে আমরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করব।

রোমান হরফে কেরিনা হাঁসদার একটি কবিতা :

Arho sadeya ona nagra?
Ajkare luture hec adina
Nagra reak sade
Anjom katen evena
hul lagidok kana monemened
ona nagra do ingea hohoan kana
Nunak in guni bhabik kana
Nowa nagra do cedak sade kana
Hoeto gelhajar horko hoyoka
Uni nagradare newta kidina

Ar kolkaa sece calawena
Pahil Khoboar do unigeye emadina
Bancaw reak hor sedrae hoyoka tabona
rarae hoyok tabona janga reak cikri
Majajon kikyawatea meneda
Eae ocogokpe
Nowa jumi malik don in kana
E dada cete mitan kana mahajon do?
Nowa jumi malik don bagkana?
150 bochor reak inak thai
Ar inal chat chat tetanidin lutikin
Atuk gadakin cetan re
Banar metkin nel namet tahekana
Sonate perec akan gda.
Mit mite lob ar lalodsteko perecena
Met parawat kowa
Nui Kuri doe okoe ren kana?
Mahajon babu miseran
Fulmuni
Gapa kol kaime
Rellanen arere hasa dipil hoyaka
E adibasi jagwarokpe
Olok parhap eedpe, kill hametpe
Ar ruime nagra
Tobe ruara amak hok
Rukhiyaka goko katha
Ar namam laere mit cuput daka.

কবির বাংলা অনুবাদ :

আবারও কি বাজবে নাগড়া?
হঠাৎ কানে বাজে এক পরিচিত
নাগড়া শব্দ
শুনে জাগ্রত হলাম
এক বিদ্রোহ অনুভূতি একেবারে যেন
সেই নাগড়া-মাদল আমাকেই ডাকছে।
আমি বিস্ময়ে ভাবছি এমন করে

এই নাগড়া কেন বাজতে পারে?
প্রায় সাথে দশ হাজার মানুষ
হবে না হয়তো কিংবা আরও বেশি
সেই নাগড়া আমাকেই যেন কোনো এক
বার্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে কলকাতার দিকে।
আমি সেই নাগড়াদারের কাছেই প্রথম
খবর পেলাম মুক্তির পথ খুঁজতে হবে
খুলতে হবে পায়ের লোহার শিকল
জোতদার চিৎকার করে বলছে
এই তোমরা সরে দাঁড়াও
এই জমির মালিক আমি।
ও দাদা, কী বলছে মহাজনবাবু?
এই জমির মালিক নাকি আমি না?
মুখ থুবড়ে পড়ে আছি ১৫০ বছর
আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট ঠেকে আছে
নদীর ওপর
আমি দুই চোখ ভরে দেখতে পেতাম
সোনালি শস্যের মাঠ।
একে একে সব যেন লোভ, লালসা
চোখ পড়ে মহাজনবাবুদের
এই মেয়েটি কার?
মহাজনবাবু এ তো আমার বোন
ফুলমণি
আগামীকাল পাঠিয়ে দে
রেললাইন ধারে মাটি ফেলতে হবে।
হে আদিবাসী তোমরা জাগো
গ্রহণ করো শিক্ষা, অর্জন করো জ্ঞান
আবার বাজাও নাগড়া
ফিরে পাবে অধিকার
রক্ষা পাবে মাতৃভাষা
আর পেটে এক মুঠো ভাত।

অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা

বাংলাদেশে বাঙালির বাইরে ৪০টির বেশি নৃগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের সংখ্যা সাকল্যে প্রায় ১৫ লাখ। এ দেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীগুলো পৃথিবীর অন্যতম চারটি ভাষা-পরিবারের প্রায় ৩৭টি ভাষা ব্যবহার করে। অনেক গবেষক মনে করেন, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তঞ্চঙ্গ্যা চাকমার উপভাষা। কেউ কেউ রাখাইনকে মারমা ভাষার উপভাষা, লালং বা পাত্রকে গারোর, আর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও হাজংকে বাংলা ভাষার উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন। সে ক্ষেত্রে কারও কারও মতে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর ভাষাসংখ্যা দাঁড়ায় ২৬-এ।

এই সবগুলো ভাষার পরিস্থিতি একরকম নয়। কয়েকটি জনগোষ্ঠীর কথা এখানে তোলা যায়, যারা সংখ্যায় একেবারে অল্প নয়। চাকমা, সাঁওতাল, গারো, ত্রিপুরা, মারমা, ওরাওঁ—এসব নৃগোষ্ঠীর প্রত্যেকের জনসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। ওরাওঁদের মধ্যে দুটি ভাষা প্রচলিত—সাদরি ও কুড়ুখ। এর মধ্যে কুড়ুখভাষীর সংখ্যা ২৫ হাজারের মতো। এসব ছাড়াও এমন কিছু ভাষা রয়েছে, যেগুলো আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং জনসংখ্যার বিচারে বিপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। এই বিপন্ন ভাষাগুলোর মধ্যে লুসাই, খুমি, বম, খেয়াং, মুরং ও পাংখোয়ার কথা বিশেষ করে বলা যায়।

আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ইউনেসকো ও সহযোগী কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে বাংলা লিপিতে পাত্র, কুড়ুখ প্রভৃতি ভাষার বই বের হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ছয়টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক-নির্দেশিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের লিপি তাদের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথম পর্যায়ে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি ভাষাভাষীদের নিজস্ব

ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার সঙ্গে এসব ভাষার মোটামুটি লেনদেন ঘটেছে। ইন্দো-আর্য পরিবারভুক্ত সাদরি ও চাকমাসহ কয়েকটি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে দীর্ঘকাল অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের মুন্ডা ও সাঁওতালি ভাষাভাষীদের সান্নিধ্যে থাকার ফলে এ ভাষা দুটির প্রভাব বাংলায় পড়ে থাকতে পারে।

যে ভাষার কোনো লিপি নেই, সে ভাষায় ছড়া বা গান থাকলেও সাহিত্য যথার্থভাবে বিকশিত হওয়া কঠিন। আমরা এ পর্যন্ত যেসব ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছি, তার প্রায় সবগুলো ভাষারই লিখিত রূপ আছে। পাংখোয়া, বম ও লুসাই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা না থাকলেও আজকাল তারা রোমান হরফ ব্যবহার করছে; রোমান হরফে নিজেদের ভাষা লিখছে। মারমা ও রাখাইনরা বর্মি লিপি ব্যবহার করে থাকে। খুমি, ঠার, থেক বা ঠেট, মালো, মাহালি, পাহাড়িয়াদের কোনো বর্ণমালা নেই। চাক ও ম্রোদের দীর্ঘদিন কোনো বর্ণমালা ছিল না। এখন তারা নিজেদের উদ্ভাবিত বর্ণমালা ব্যবহার করছে। সাঁওতালরা বাংলাদেশ ও ভারতে তিনটি বর্ণমালা ব্যবহার করে—অলচিক, বাংলা ও রোমান। খাসিয়া ভাষা রোমান বর্ণমালায় লেখা হয়। এখন অনেক খাসিয়াভাষী খাসিয়া ভাষা লিখতে বাংলা লিপি ব্যবহার করছে। ককবরক ভাষা লিখতে বাংলাদেশ ও ভারতে বাংলা ও রোমান লিপি ব্যবহার করা হয়। হাজংদের নিজস্ব ভাষা আছে কিন্তু বর্ণমালা নেই। বাংলাদেশে হাজং ভাষা লেখা হচ্ছে বাংলা হরফে; ভারতের আসামে অহমিয়া এবং মেঘালয়ে রোমান ও অহমিয়া বর্ণমালায় লেখা হচ্ছে হাজং ভাষা।

নানা উপলক্ষে ভারত থেকে এ দেশে আসা অভিবাসীরা একসময় ব্যাপক হারে নাগরী লিপি ব্যবহার করত। কিছুদিন আগেও সিলেটে এ লিপির চর্চা ছিল। এখন নাগরী লিপির ব্যবহার নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশে বহিরাগত অভিবাসীরা অহমিয়া, উসাই, উড়িয়া, কামতাপুরী, কুর্মালী, কোচ, কোডা, গুড়িয়া, ডালু, তেলেগু, নেপালি, পাংখোয়া, পাহাড়ি, বড়াইক, ভোজপুরি, মান্দারাই, মাড়ওয়ারি, মালপাহাড়ি ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে একাধিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সাদরি ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। এখানে তরুণ কবি কালিদাস রায়ের সাদরি ভাষায় বাংলা হরফে লেখা একটি কবিতা ও কবিকৃত বাংলা-অনুবাদ দেওয়া হলো :

ইতিহাসে আদিবাসী

যুগ যুগ ধরিকে, ফটা ফটা ঘাম ঝরায়কে
বানালায় গাঁও, বানালায় নগর
বানালায় শহর, বন্দর, ই-দুনিয়া কতই সুন্দর
এ্যাহে আদিবাসী এবদিন।
যখন এ দুনিয়া রেহে পাথর
আবাদ ন্যাই, পানি ন্যাই, রেহে শুধু সাগর।
নদী, সাগরে যব হরিণ, বাঘ
হাতি, ঘোড়া, পিয়হলাই পানি
তখনি রিহি আদিবাসী, এই হানি।
দিনে দিনে বনাকর, ফলাহার ছড়কে,
হিনে হুনে সে বুদ্ধি খুজি কেরকে
আনলি হানি আবাদকর বান
ই-দুনিয়াকে যভে করলি দান
তবু দুনিয়ারে হানিকর কাঁহা সম্মান?
কাহা পাওয়িলা দাম?
সেময়কর আদিবাসী মান রাজা
এখন হলায় নিঃস্ব প্রজা
বিন জাতকর বগল হেঁটে
করিলা বসবাস

কবিকৃত ওই কবিতার বাংলা :

ইতিহাসে আদিবাসী

যুগ যুগ ধরে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরায়ে
গড়ল গ্রাম, গড়ল নগর
গড়ল শহর-বন্দর, এই-দুনিয়া কতই সুন্দর
এই আদিবাসী মানুষেরা।
যখন এ দুনিয়া ছিল পাথর
আবাদ নাই, পানি নাই, ছিল শুধু সাগর।
নদী, সাগরে যেদিন হরিণ, বাঘ
হাতি, ঘোড়া খেত পানি
তখন ছিলাম আমরা এই আদিবাসী।
দিনে দিনে বনে ফলাহার ছেড়ে

এদিক ওদিক থেকে বুদ্ধি খুঁজে
এনেছি মোরা ফসলের বান
এই পৃথিবীকে মোরা করেছি দান
তবে পৃথিবীতে মোদের কোথায় সম্মান?
কোথায় পেলাম দাম?
সে সময়ের আদিবাসী রাজা
এখন হয়েছে নিঃস্ব প্রজা।
ভিনদেশিদের পদতলে
করে বসবাস।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রভাবে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্ব-স্ব মাতৃভাষার উন্নয়নে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে মেনলো ম্রো 'ক্রোমাদি ম্রো' বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। মোট ৩১টি বর্ণ ও ৯টি সংখ্যার ওই বর্ণমালার সঙ্গে চৈনিক, থাই, বর্মি ও রোমান বর্ণমালার মিল রয়েছে। মেনলে ম্রো 'ক্রামা' ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং ১৯৮৬ সালে ১৫ আগস্ট আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরুদ্দেশে চলে যান। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর মেনরুম ম্রো রিয়েন নামে একটা ম্রো ফন্ট তৈরি করেন।

২০০৬ সালে মাহালে জাতি রোমান হরফের সমন্বয়ে পরিবর্তিত এক বর্ণমালা প্রকাশ করে। তাদের মাহালে ভাষায় পাঁচটি স্বরবর্ণ ও ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। ২০১২ সালে চাক বর্ণমালা উদ্ভাবন করা হয়েছে।

লেঙাম বর্ণমালা

গারোদের সঙ্গে সম্পর্কিত লেঙাম জনগোষ্ঠী লেঙাম থপিরসইট নামে এক বর্ণমালা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী গারো, খাসিয়া ও বমরা রোমান হরফের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নিজেদের বর্ণমালা তৈরি করেছেন। খ্রিষ্টানদের মধ্যে রোমান হরফের প্রভাব বেশি।

ওরাওঁ, কোচ, কোল, পাত্র ও বর্মণদের জন্য বাংলা হরফ ব্যবহার করে মাতৃভাষা শিক্ষার বই প্রকাশিত হয়েছে।

অহমিয়া : পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে অহমিয়া জনগোষ্ঠীর লোকজন বহুদিন ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি হবে না। এরা মঙ্গোলয়েড মহাজাতিভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের অহমিয়াদের বেশির ভাগ তাদের মূল কাছাড়ি ভাষায় কথা বলে না। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে অহমিয়া ভাষা বেশ পরিবর্তিত হয়েছে।

ওরাওঁ : ওরাওঁরা বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে কোনো একসময় বাংলায় এসেছিল। এ তথ্য তাদের এক অজ্ঞাত কবির গান থেকে পাওয়া যায় :

নাগপুরের নাগরাজা
নাভালায় বাত্তালানে
আদিবাসী হামিহেকী
ওরাওঁ জাতি।

নাগপুরের নাগরাজা
আত্তলে বাঙালা মে
তাম্বু থাকলে ও কাছে
ও আদিবাসী হামিহেকী
ওরাওঁ জাতি ॥

বাংলায় অনুবাদ :

নাগপুরের নাগরাজা
বাংলায় এসে নামল
আমি আদিবাসী
ওরাওঁ জাতি ॥

নাগপুরের নাগরাজা
বাংলায় এল
কাছে কাছে তাম্বু ঠেকাল

আমি আদিবাসী
ওরাওঁ জাতি ॥

জয়পুরহাটের ওরাওঁদের মতে, তাদের পূর্বপুরুষরা সুদীর্ঘকাল ধরে এ এলাকায় বাস করে আসছে। নাগরী তাদের নিজস্ব ভাষা। এখানে নন্দরানী মিন্‌জের একটা ওরাওঁ গীত দেওয়া হলো :

আইখ বিনা ভাইরে দুনিয়া যে, আন্ধার দিনে ঘারী
ভাইরে হামনিকের দাসা সেহেতারি
বুড়হা বুড়িহা মানকের ক্ষেতখলা সিরাই গেলেই ভাইরে
ভাইরে হামনিকের দাসা সেহেতারি
লেখা পড়হা নি জানিলা না জেনকে টিপ দিওইলা ভাইরে
ভাইরে হামনিকের দাসা সেহেতারি
মাঠে ঘাটে খাটিলা দিনকে কাটাইলা ভাইরে
ভাইরে সংসার চালেলা কোনই তারি
ভাইরে হামনিকের দাসা সেহেতারি।

কবির বাংলা অনুবাদ :

চোখ ছাড়া ভাই দুনিয়াটা দিনের সময়ও অন্ধকার
ভাই আমাদের অবস্থা সে রকম
লেখাপড়া না জানার ফলে যেমন টিপ দেয়
আমাদের অবস্থা সে রকম
মাঠে ঘাটে কাজ করে দিন কাটাই
সংসার চলে কোনোরকম
আমাদের অবস্থা সে রকম।

কারাম ওরাওঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব। কারামের একটি গান :

বারো মাস হিংসে নালেরে কারাম ॥
হায় কারাম বের দাগা দেলরে
ও ভাই হায় কারাম বের দেগা দেখরে।
কেমরা আফসালায় কেমরা পিয়াসালায় ॥
কেমরা কারমা গাড়ায়রে ॥
ও ভাই কেমরা কারাম গাড়ায় রে
ভাই মরা আফসালায় বোহিন মরা পিয়াসালা ॥
কেমরা কারমা গাড়ায় রে
ও ভাই কেমরা মরা কারমা গাড়ায়রে
কামরা গাড়াইতে ভেল সামরে তুলরে ॥
চেল যাহো আখরা ছলাইতে ॥

ও ভাই চেল যাহো আযরা ছসাইতে।

বাংলায় সংক্ষেপে গানটির অর্থ :

কারাম উৎসব বারো মাস পর একবার আসে, তাই আনন্দে নাচ-গান করি। ভাই-বোনের মধ্যে কথা হয়, কে কারাম গাড়ায়। ভাই বলে আমি কারাম পূজা করব। তার কথায় প্রত্যেক কাজ করতে বারো মাস সময় লাগবে।

কন্দ : উনিশ শতকের মাঝামাঝি মূলত রেললাইন স্থাপন ও চা-বাগানে কাজের জন্য উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে কন্দদের বাংলাদেশে আনা হয়। কন্দ সমাজ কন্দফারসি নামক ভাষাকে তাদের আদি ভাষা বলে উল্লেখ করে। বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো এ ভাষায় কথা বলতে পারে। বর্তমানে কন্দদের ভাষা উড়িয়া। আর্যভাষার অন্তর্গত উড়িয়া ভাষার বর্ণমালা রয়েছে।

কর্মকার : আনুমানিক দেড় শ বছর আগে ভারতের রাঁচি অঞ্চল থেকে কর্মকার জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আসে। তারা এখন জয়পুরহাট, রাজশাহী, নাটোর, দিনাজপুরের বিরামপুরে বসবাস করে। তারা নিজস্ব ভাষাকে নাগরী বললেও তার কোনো অক্ষর বা লিপি নেই। এ ভাষায় তারা পরিবারের মধ্যে কথা বলে, পরিবারের বাইরে কথা বলে বাংলা ভাষায়।

কোচ : বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও গাজীপুর এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলায় কোচরা বাস করে। কোচদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। কেবল প্রবীণ ব্যক্তিরাই এ ভাষায় এখন কথা বলে।

কোল : রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুর জেলার কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামে কোল জনগোষ্ঠী বাস করে। তাদের জীবনযাত্রায় কৃষিভিত্তিক জীবনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কোলদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও বর্ণমালা নেই। বাংলা ভাষার প্রভাবে কোল ভাষার সঙ্গে অনেক বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সাঁওতালি ও কোল উভয় ভাষায় 'ফুল'কে 'বাহা', 'ভাত'কে 'দাকা', 'পানি'কে 'দাও', 'বলদ'কে 'ডাংরা', 'মহিষ'কে 'কারা', 'ছাগল'কে 'মেরম', 'ভেড়া'কে 'ভেড়ি' বলা হয়। কোলরা 'বাবা-মা'কে 'আইয়ো', 'কাকা'কে 'কাকা', 'দাদা'কে 'দাদা' বলে সম্বোধন করেন। তারা অন্যদের সম্ভাষণ জানায় 'ডোবো' বলে।

কোলদের থুবড়া অনুষ্ঠানের একটি গান :

আনা দানাহে সোনা

শ্বশুরে চুমাইতেরে পুতা

বাবা চুমাইতেরে বেটা
দাও না ফুলাহে মাওরে
চাউ মাসাহে কুইয়া
দুদে পুঁতে হে হইয়া

বাংলায় :

ছেলে এখন সোনার মতোই
শ্বশুর এখন তোমাকে চুমু দেবে
বাবাও এখন চুমু দেবে
তুমি এখন গাল ফুলিয়ে,
রাগ-ঝাল করিও না

খাড়িয়া : বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার চা-বাগান এলাকায় খাড়িয়ারা বাস করে। জর্জ গ্রিয়ারসনের মতে খাড়িয়া ভাষাটি মুন্ডারী ভাষার একটি শাখা। গুটি কয়েক প্রবীণ ব্যক্তি ছাড়া এখন কেউ খাড়িয়া ভাষায় কথা বলে না। খাড়িয়ারা এখন সাদরি ভাষায় কথা বলে। খাড়িয়া ভাষা রোমান, দেবনাগরী ও বাংলা হরফে লেখার চেষ্টা করা হয়।

খিয়াং : পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি হলো খিয়াং জনগোষ্ঠী। রাঙামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী, কাপ্তাই এবং বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর, রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় খিয়াংরা বাস করে। খিয়াংদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। একটা শব্দ দিয়ে উচ্চারণভেদে অনেক অর্থ বোঝানো হয়। যেমন—'চী' শব্দের অর্থ 'দিদি'। আবার 'চি' অর্থ 'ছাঁকা' বা 'লবণ' বোঝায়। খিয়াংদের ভাষায় নানা ধরনের গান ও ছড়া রয়েছে। এখানে আমরা একটি গানের উদাহরণ দিই :

বেলেক চ্ও খ্রহোমও
লুংখিং লুংখিয়াং নেমেই ন্ তি-এই
তেকেলেন লা থিং পোক স্ চে
কেইবে লেক চ্লা হেউ সুই সতিং কিখিন নু
সুগ্ন সেই অং চং ফোউ বে-ই
লংবয়হ্ খ্রাওং চং হো বে-ই
সকি খো ওং চং চেল বে-ই।
অঙ তেউয়া বেন লু-আক হূইহ্
উই থেই তেউয়া য়োং পুমাক হূইহ্
সুসিম তেউয়া লানসু তেউয়া

লুখিং লুখিয়াং নেমেই ন্ তি-এই।

বাংলায় অনুবাদ :

জোছনার আলোর মতো ভাই আমার
একা একা তুমি রয়েছ,
কাঠঠোকরা পাখির গাছ ঠোকরানোর শব্দে মনে হচ্ছে
তুমি বনে লাকড়ি সংগ্রহ করছ,
আমলকীর পাতায় ধানগুলি শুকাতে দিয়ো,
এক প্রকার বড় পাখির পালকে ধানগুলি ঝেড়ে নিয়ো
আর হরিণের পায়ে ধানগুলি নেড়ে যেয়ো।
কাকের ঝাঁকের মাঝে একটি বকের মতো,
শিকারি কুকুরের মাঝে একটি বানরের মতো,
নির্জন পাহাড়ের শত্রুর মতো একা একা রয়েছ তুমি।

খুমি : পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় ঝুমা, রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় খুমি জনগোষ্ঠী বাস করে। জনসংখ্যায় অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় কম হলেও তাদের নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি রয়েছে। তারা শহর থেকে উঁচু পাহাড়ে সমাজবদ্ধভাবে বাস করে।

টিএইচ লুইন মনে করেন আরাকানি 'খু' (কুকুর) ও 'মি' (মানুষ) থেকে খুমি শব্দটা এসেছে, যার মানে হচ্ছে খুমিরা কুকুর-মানুষ, যারা কুকুরের মাংস খেতে ভালোবাসে। লেলং খুমি এই মতকে অগ্রাহ্য করেন। তিব্বতি-কুকি-চীন ভাষার দুই ভাষাবিদ ডেভিড এ পিটারসন ও ড. কেনেথ ভানবিকের অভিমতকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। Zomi শব্দটি কালক্রমে Hyomi এবং Hyomi শব্দটি Khyomi এবং Khomi থেকে Khomi শব্দটি এসেছে।

চট্টগ্রামের খুমি, খিয়াং, বম ও লুসাইয়ের ভাষা কুকি-চীন দলভুক্ত। সাধারণত এদের বাক্যবিন্যাস হয় বিশেষ্য, অব্যয় ও ক্রিয়ার আঙ্গিকে বাংলা, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরার ভাষার মতো। যেমন, 'আমি ভাত খাই'-এর খুমি হলো 'কাই (আমি) বিউ (ভাত) চা (খাই)'। খুমি ভাষা প্রধানত তিনটি স্বর রয়েছে, বিভক্তিভেদে ৯/১০টি স্বর লক্ষ করা যায়। খুমিদের ভাষার ২৫টি অক্ষর রোমান হরফে নিম্নরূপ :

A	**Y**	**YH**	**AW**	**B**	**CH**	**D**
E	F	H	I	J	K	L
M	N	NG	O	P	R	S
T	U	V	Z			

প্রথম চারটি এবং ষষ্ঠ অক্ষর ছাড়া অন্য অক্ষরগুলোর উচ্চারণ ইংরেজি বর্ণমালার উচ্চারণের মতো।

গণ্ড : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, সিলেট অঞ্চল গণ্ড জাতির বাস, তাদের ভাষা নাগরী ভাষার অন্তর্ভুক্ত হলেও বর্তমানে নিজেদের কোনো বর্ণমালা নেই। বাংলা ভাষার ব্যবহার ও প্রভাবে তাদের ভাষা এখন বিলুপ্তপ্রায়।

গুর্খা : পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও বাংলাদেশের ঢাকা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, পটুয়াখালী, প্রভৃতি অঞ্চলে গুর্খাগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। তাদের ভাষা নেপালি ইন্দো-আর্য ভাষা-পরিবারভুক্ত। নেপালি ভাষা দেবনাগরী বর্ণমালায় লেখা হয়। বাংলা ও নেপালি ভাষার মধ্যে শব্দ ও ব্যাকরণগত কিছু সামঞ্জস্য থাকায় এবং লোকসংখ্যার স্বল্পতার জন্য গুর্খারা এখন তাদের গান, কবিতা ও সাহিত্যের চর্চা করে থাকে বাংলা হরফে। বয়োজ্যেষ্ঠ গুর্খাদের মধ্যে কেউ কেউ দেবনাগরীর সঙ্গে পরিচয় এখনো অক্ষুণ্ন রেখেছে।

ডালু : ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও শেরপুরের নালিতাবাড়ী অঞ্চলে ডালুদের বাস। তাদের অনেকে মনে করে মণিপুরিই হচ্ছে তাদের আসল ভাষা। তাদের কথাবার্তায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যা বাংলা ভাষায় নেই। দীর্ঘদিন বাংলাভাষীদের পাশাপাশি বাস করার ফলে, অতীতে তাদের কোনো ভাষা থাকলেও তা এখন হারিয়ে গেছে।

তুরি : বাংলাদেশের বাইরে থেকে তুরি জাতির লোকজনকে ব্রিটিশ আমলে রেলপথ স্থাপনের কাজে আনা হয়েছিল। জয়পুরহাট উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় তারা বসবাস করে। তাদের ভাষার কোনো বর্ণমালা বা লিখিত রূপ নেই। তাদের ভাষায় নাগরী, হিন্দি ও বাংলা ভাষার প্রভাব রয়েছে।

পাংখোয়া : পাংখোয়া ভাষায় পাং অর্থ শিমুল ফুল আর খোয়া অর্থ গ্রাম। মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী পাংখোয়াদের বিশ্বাস, তারা লুসাই পাহাড়ের পাংখোয়া গ্রাম থেকে এসেছিল। সাধারণত উঁচু পাহাড়, গভীর জঙ্গল বা লোকালয় থেকে দূরে জনবিরল এলাকায় তারা বাস করে। তারা লুসাইদের মতো একই ধরনের রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে।

পাত্র : স্বল্প পরিচিত পাত্র জনগোষ্ঠী একমাত্র সিলেট জেলাতেই বাস করে। তাদের ভাষার নাম লালেং থার। এই ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা বা অন্য কোনো ভাষার মিল নেই। এই ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। এ নিয়ে তেমন কোনো গবেষণাও হয়নি।

পাহাড়িয়া : পাহাড়িয়ারা উত্তর বাংলাদেশে বাস করে। এদের মধ্যে তিন ধরনের পাহাড়ি রয়েছে—শাহরিয়া, মালো ও কুমুর পাহাড়িয়া। প্রত্যেকের আলাদা জীবনাচার ও সংস্কৃতি রয়েছে। এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মালো ভাষায় কথা বলে। এখনো তাদের ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই।

বর্মণ : গাজীপুর, ময়মনসিংহের ভালুকা, টাঙ্গাইলের সখীপুর ও মির্জাপুর উপজেলায় বর্মণ জনগোষ্ঠী বাস করে। তাদের নিজস্ব ভাষা 'নাগরী' বাংলা ভাষার প্রভাবে হারিয়ে গেছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বর্মণ ভাষায় কথা বলতে পারে না। বর্মণদের কিছু পুরোনো নথিপত্রে নাগরী বর্ণমালার নিদর্শন রয়েছে।

বানাই : বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট, শেরপুর নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, বালবালচড়া এলাকায় যে বানাই জনগোষ্ঠী বাস করে, তাদের ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই। বানাই ও হাজং ভাষার মধ্যে অনেক মিল থাকলেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

ভূমিজ : ভূমিজদের আদি নিবাস ছিল ছোট নাগপুর ও হাজারীবাগ অঞ্চলে। বাংলাদেশের রাজশাহী, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার চা-বাগানে তাদের বসবাস। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তারা পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে। পৌষসংক্রান্তিতে ভূমিজরা টুসু পর্ব পালন করেন। একটা টুসু গানের কথা :

চল গো ললিতা যমুনায়
বাঁশি কে বাজায়, ঐ ঘাটে শোনা যায়
যখন আমি রাঁধতে বসি
তখন কালায় বাজায় বাঁশি
রাঁধা-বাড়া রেখে আমি কেমন করে আসি গো।

মাহালী : একটি আদিবাসী জাতির নাম। গোদাগাড়ী উপজেলার সুরশুনি গ্রামে মাহালিরা বাস করে। রাজশাহী জেলার একটা উপজেলা গোদাগাড়ী। এ ছাড়া বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি এলাকায় মাহালীদের আবাস রয়েছে। H H Risley তাঁর *The Tribes and Castes of Bengal* গ্রন্থে মাহালী ও সাঁওতালদের মুন্ডা গোত্রভুক্ত বলেছেন। বাংলাদেশের মাহালীদর নিজস্ব ভাষা আছে। 'মাহালী' শব্দটি সাঁওতাল ভাষার 'Mah' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ বাঁশ। মাহালীদের মাতৃভাষার নাম মাহালে। এখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি অক্ষরে লেখা হচ্ছে। মাহালী ভাষার বর্ণমালা :

A E I O U Ã Ẽ Ĩ Õ Ũ

B C D G H K L M N P R S T W Y

Ć Ḱ Ṕ T́ Ń N Ḍ Ṛ Ṭ

BH CH DH ḌH GH JH KH PH TH TH

মাহালী বর্ণমালা। প্রথম পঙ্‌ক্তি স্বরবর্ণ (*বাংলাদেশের মাহালী*, বারসিক, ঢাকা, ২০০৬)

মাহালী ভাষার স্বরবর্ণগুলো নাসিকা বর্ণ হিসেবে উচ্চারণ করা যায়, খুব অল্পসংখ্যক মাহালী ভাষার লোক এখন নাসিকা বর্ণ উচ্চারণ করেন। বর্ণগুলো হলো : Aa, Ee, Ii, Oo, Uu।

লুসাই : পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হলো 'লুসাই'। লুসাইরা বর্তমানে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি থানার সাজেক উপত্যকায়, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ও সিলেটে বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাংখোয়া, বম, লুসাই, খিয়াং ও খুমি এই পাঁচটি জনগোষ্ঠী তিব্বতি বর্মি পরিবারের কুকি চীন নাগা, কুকি-চীন দলের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৯৪ সালের ১১ জানুয়ারি ভারতের মিজোরামের রাজধানী আইজল-এ আর্থিংটন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি রেভারেন্ড এফ ডব্লিউ সেভিড্‌জ এবং রেভারেন্ড জে এইচ লোরিন লুসাই বর্ণমালা তৈরি করেন। লুসাই ও পাংখোয়াদের বর্ণমালা নিম্নরূপ :

A	AW	B	CH	D	E	F	G	
	আ	অ	বি	চ	ডি	এ	এফি	জি
NG	H	I	J	K	L	M	N	O
এ্যাং	এইচ্	ই	ইজে	কে	এল	এম	এন	ঔ
P	R	S	T	□	U	V	Z	
পি	আর	এসি	তি	টি	উ	ভি	জেত্	

হাজং : বাংলাদেশে, বৃহত্তর ময়মনসিংহের উত্তরাংশে গারো পাহাড় ও এর পাদদেশে বসবাস করে হাজংরা। হাজংদের ভাষা থাকলেও সে ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বাংলাদেশের হাজংরা তাদের ভাষা বাংলা হরফের মাধ্যমে লেখে। হাজং ভাষা মূলে তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এ ভাষায় অসমিয়া কাছাড়ি ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। হাজং

নামকরণ সম্পর্কে তাদের মধ্যকার শিক্ষিতদের মত, হাজং শব্দের অর্থ হলো 'সংঘবদ্ধ থাকি'। এখানে একটি হাজং ছড়া দেওয়া হলো :

মুলা ডাক
আয় রে তুরা চিংরা চিংরি
আয় তুরা হুবাই
এক হব আমরা
যত আছে হাজং ভাই।
হিংসা নিন্দা থুয়া
দেশ গড়ং হুবাই।
দেশরে ভালবাসং হুবাই
দেশলা কাম করং;
দরকার হলে নিজালা
জীবুন্দা দান করং।
আয় তুরা ভাই বুইনি
দেশলা কামে লড়ং।

বাংলায় অনুবাদ :

আমার ডাক
এসো যত যুবক-যুবতী
এসো তোমরা সবাই,
এক হব আমরা
যত আছে হাজং ভাই।
হিংসা নিন্দা রেখে
দেশ গড়ি সবাই।
দেশকে ভালোবেসে সবাই
দেশের কাজ করি,
প্রয়োজনে আমরা মোদের
জীবন দান করি।
এসো তোমরা ভাইবোন
দেশের কাজে লড়ি।

আরও কয়েকটি ভাষা

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় তিন-চার শ রাই পরিবার বাস করে। তাদের ধারণা, তাদের যে নিজস্ব ভাষা ছিল তা হারিয়ে গেছে। এখন তারা বিকৃত বাংলায় কথা বলে।

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় রাউতিয়ারা বাস করে। তারা সাদরি ভাষায় কথা বলে, তার কোনো বর্ণমালা নেই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে রাজবংশীয় বাস করে। তাদের ভাষা যেহেতু বোড়ো ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাই সে ভাষার সঙ্গে কোচ, পলিয়া ভাষার বহু মিল পাওয়া যায়। বর্তমান রাজবংশীয়রা যে ভাষায় কথা বলে, তা বলতে গেলে বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা।

দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় রাজোরাও জাতির বাস। তাদের মতে, তাদের পূর্বপুরুষদের কাল থেকেই বাংলাই তাদের মাতৃভাষা এবং বাংলা বর্ণমালা তাদেরই বর্ণমালা।

মাহাতোদের আগে কুর্মী বলা হতো। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে তারা মাহাতো এবং সিলেটের চা-বাগান অঞ্চলে কুর্মী নামে পরিচিত। তাদের ভাষার নাম কুর্মালী। তাদের ভাষার কোনো বর্ণমালা নেই, দেবনাগরী বর্ণমালায় তাদের ভাষা লেখা হয়।

উপসংহার

১৯৫৩ সালে ইউনেসকোর এক প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়, প্রতিটি শিশুর তার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। শিশুর ভাষার মানবাধিকার সম্পর্কে বলা হয়, প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষা শনাক্ত করার অধিকার থাকবে। প্রতিটি শিশু মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। প্রথমটি প্রয়োগ করা বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার যে পৃথিবীর ছয়-সাত হাজার ভাষার বেশির ভাগের ক্ষেত্রে স্কুলে শিক্ষকের অভাব সহজে দূর করা কঠিন। ইউনেসকো বা জাতিসংঘ ভাষার অধিকার সমর্থন করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বহু রাষ্ট্র এই অধিকার-প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য বলে মনে করে না। কারণ, প্রস্তাবগুলোর আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

এটা বড় আনন্দের কথা, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা হলেও দেশের কোনো ভাষার প্রতি আমরা কোনো বৈরিতা লক্ষ করি না। জাতিসংঘের মানবাধিকার-সম্পর্কিত বিধানাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দেশের প্রতিটি ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা যে প্রস্তাবই রাখি না কেন, প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীকে নিজেদের ভাষার উন্নতির জন্য নিজেদেরই উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো ও চাক জনগোষ্ঠী সম্প্রতি নিজেদের জন্য বর্ণমালা তৈরি করেছে; নিজেদের বর্ণমালায় শিক্ষাদানের ফলে তাদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে সাক্ষরতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে দেশের আদিবাসী তথা সরকারি ভাষায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গঠিত জাতীয় কমিটি চাকমা, মারমা, ককবরক, মান্দি, সাঁওতালি ও সাদরি ভাষার পাঠ্যপুস্তক তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে সাঁওতালি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরির বিষয়টি। সাঁওতালরা ইংরেজি বা বাংলা কোনো লিপি ব্যবহার করবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দেওয়া হয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ওপর। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষা লেখা হয় বাংলা হরফে। বাংলাদেশের ত্রিপুরারা তাদের দাবি অনুযায়ী রোমান হরফ গ্রহণ করেছে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম তাদের মাতৃভাষা শিক্ষার আওতায় আনার কথা উঠেছে। বাংলাদেশের বাস্তবতার কথা চিন্তা করলে এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন খুমি, খেয়াং, পাংখোয়া ইত্যাদি সংখ্যায় স্বল্প, তাদের আবাস দুর্গম এলাকায়। সেখানে আদিবাসীদের কোনো সরকারি বিদ্যালয় নেই এবং মাতৃভাষা শিক্ষাদানকারী শিক্ষক তৈরি করতেও সময় লাগবে।

ক্রমান্বয়ে সম্ভাব্য সব আদিবাসীর মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সম্পন্ন করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। প্রাথমিক সমাপনী বা পঞ্চম শ্রেণীতে যাওয়ার আগেই ভাষিক সেতুবন্ধ বা ব্রিজিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। মাতৃভাষা থেকে পর্যায়ক্রমে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শেখা এবং বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য বহুভাষিক শিক্ষা বা মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

নির্ঘণ্ট